KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/4 22/3 22/4 23/2	Year of Publication : Dec 1956 (আশ্বিন ১৩৬৪) (চৈত্র ১৩৬৫) (আশ্বিন ১৩৬৫) ((পৌষ ১৩৬৫)
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

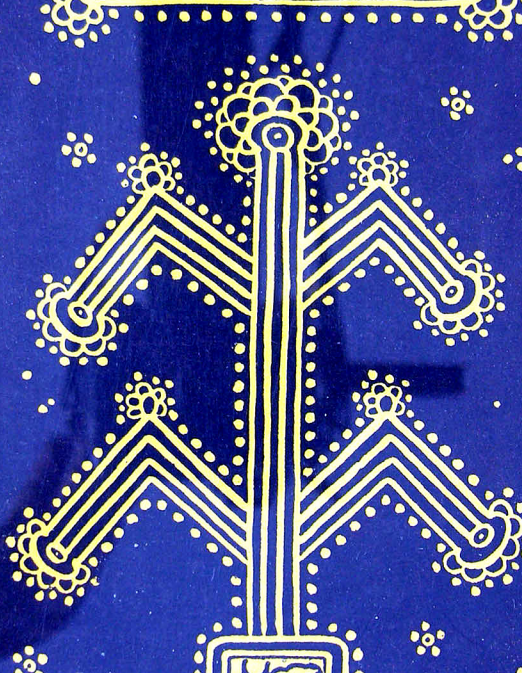

সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু

আষাঢ় ১৩৬৫
দাম এক টাকা

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৬৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ৪
ক্রমিক সংখ্যা ৯৪

যত সব টেকো মাথা

বিষ্ণু দে

Bald heads forgetful of their sins—Yeats.

যত সব টেকো মাথা নিজেদের পাপ ভুলে গিয়ে
জরজরে পণ্ডিত যত মান্য মোটা মাথা
থীসিসে ডাক্তার হয় সাহিত্যের থাইসিস ছড়িয়ে,
বই সম্পাদনা করে, টীকাভাষ্য লিখে যায় যা-তা,
কবিতার নাটকের, লিখেছে যা যুবকেরা সুখনিদ্রা ত্যেজে
প্রেমের ব্যথায়—যদি সুন্দরীর মন তাতে ভেজে।

এদের এক রা, এরা কালি ছোঁড়ে কাশির ছিটায়,
এদের জুতোর তলা ক্ষ'য়ে যায় একটি পাপোশে ;
সকলে যা ভাবে বোঝে এরা সেই ভাবনা পেটায়,
একটি গোয়ালে সেই একটি এঁড়েই এরা পোষে।
হে বিধাতা, এরা সব কী মন্তব্য করত হতাশ
এদের পথেই যদি চলতেন কবি কালিদাস ?

সুটীভন স্পেণ্ডর : দুটি কবিতা

বেঠোফেনের অন্তিম মুখচ্ছদ

মনশ্চক্ষে দেখি তাঁকে, ভারাক্রান্ত এখনও ললাট।
মহাকায়, তাম্রকৃষ্ণ, নতশির, বিস্রস্ত অলক,
সমস্ত নিসর্গে তিনি লাঙল চালান। তাঁর মুখ
দেয়ালে ঝোলানো এই একটি মুখোশ, অন্তরিত রূপ,
মৃত্যুর ঢালাই মুখ, শাদা-শাদা আলোয় তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।

দেখি স্থূল হাত দুটি বাঁধা; সেই কাগতাড়ুয়ার কোট;
আলো উঠে ধাক্কা দেয় দুই গর্তে চোখের ফাটলে;
পশুটা বসেছে চেপে ঐ মুখবিবরে, যার ফাঁকে
অর্গানের নলে-নলে ফাঁপা যত বায়ুভুক্ মুখ;
ওখানে বাতাস গায়, তীক্ষ্ণ সাধ কাঁদে উচ্চরোলে।

আমার দৃষ্টির পথে তিনি যান জাহাজের মতো।
তিনি ছাড়া আর কিবা লোহা? দুই ভাগে মাঠক্ষেতবন
ভেঙে চুরে হ'য়ে যায় ফু'লে-ফু'লে সমুদ্রের পরিপ্লব জল।
তিনি বন্দী, মুখোশে প্রচ্ছন্ন, তিনি সত্তা থেকে নির্বাসিত;
ফোয়ারার মতো ওঠে জীবন, দেখেন তিনি—ঐ বাইরে জীবন।

অথচ ও-মাথাতেই জট বাঁধে গর্জমান মেঘ,
পাক খায়, যেমন শামুকে শাঁখে পাক খায় গর্জমান ঢেউ।
ভিজা পাতা চুপি-চুপি কথা কয়, নিচু হ'য়ে নেমে বৃষ্টিজলে
চৈত্র জাগে তাঁর মধ্যে, ফুসফুস নিরুদ্ধ করে তাঁর,
আর তাঁর মস্তিষ্কের যন্ত্রণার সিঁড়ি বেয়ে চলে।

তারপরে ঢাকীরা বিদায় নেয়, হয় দূরত্ব উদ্ভাস;
এবারে মেঘলা সব চূড়া নগ্ন; ঔপনিষদ একম্
দিগন্ত বিলীন করে; নীলিমা আরতি করে আকাশের,
শান্তি, শান্তি···তারপরে কঙ্কালকরোটি আর স্বপ্ন চিরে ফুঁড়ে
ঐ আসে আমাদের সব বাতি মুছে দিয়ে, তূর্যমুখে, সূর্যই স্বয়ম্॥

প্রাতঃস্মরণীয় তারা

সর্বক্ষণ তাঁদের চরিত ভাবি যাঁরা প্রকৃতই মহৎ ছিলেন।
যাঁরা, মাতৃগর্ভ থেকে, মনে রেখেছেন মানবমনের ইতিহাস,
আলোকের দালানে-দালানে, যেখানে প্রহরগুলি সূর্য সব
অন্তহীন এবং সংগীতে উন্মুখর। যাঁদের উচ্চাশা কমনীয়,
যাঁরা শুধু চান যে তাঁদের ওষ্ঠাধর, তখনও আগুনে রাঙা,
বলুক আত্মার কথা গানে-গানে ঢেকে দিয়ে আপাদমস্তক।
এবং সঞ্চয় যাঁরা করেছেন বসন্তের ডালপালা থেকে
সাধ ইচ্ছা, ঝরেছে যা তাঁদের শরীর বেয়ে মঞ্জরীর মতো।

মহামূল্য নীতি হল কখনও না ভুলে যাওয়া
রক্তের মৌলিক হর্ষ, অক্ষয় নির্ঝর থেকে ভরা,
ভেদ ক'রে বহু শিলা আমাদের পৃথিবীর কালেরও আগের।
সকালের সরল আলোয় কখনও না অস্বীকার করা তার সুখ
অথবা কদাচ তার সুগভীর সায়ন্তন প্রেমের প্রার্থনা।
কখনও না ক্রমিক অভ্যাসে ট্রাফিকের গোলমালে, ধোঁয়া কুয়াশায়
মানসের মরশুমের মুখ চেপে ধরা।

তুষারের সন্নিকটে, সূর্যের সান্নিধ্যে, সর্বোচ্চ প্রান্তরে
চেয়ে দেখ কেমন এঁদের নাম সংবর্ধনা পায় ঘাসের হিল্লোলে

আর শুভ্র মেঘে-মেঘে পতাকা নিশানে
এবং নিবিষ্ট নীলাকাশে বাতাসের আনম্র মর্মরে।
তাঁদের সবার নাম, যাঁরা আজীবন লড়েছেন জীবনের তরে,
যাঁরা নিজেদের হৃদয়ের পাশে রেখেছেন অগ্নিকেন্দ্র।
সূর্যের সন্তান তাঁরা, কিছুকাল যাত্রীও ছিলেন সূর্যলোকে,
এবং ভাস্বর হাওয়া ভ'রে দিয়ে গিয়েছেন নিজেদের গৌরবস্বাক্ষরে।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

চারটি নিবেদন ও একটি প্রশ্ন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

চোখ

(মালার্মে-কে)

চোখগুলো ছিল ভালো, এখন তেমন
উজ্জ্বলতা নেই ; দিলে মন
দেখা যায় কুয়াশা ধূসর
বহু ব্যবহারে পরপর।
যতোটুকু আলো থাকে তাকে
কাচের খাঁচায় পুরে রাখে।
এই তো নিয়ম। তাই ভাবি
ক্ষয়ের লক্ষণ বুঝি এই।
আমার গয়েরি চোখও দাবি
করেছিল কতোই না—ইয়ত্তা তো নেই !

স্বপ্নোদ্ধার

(হাইনে-কে)

স্বপ্নে নয় বাস্তবিক
তেমন দেশের পাত্তা ঠিক
জানতাম যে আজ তা দিক
করছে মন হে হাইনে !
আজকে আর তা চাইনে
চম্পা-ভাই পারুল-বোন
তাদের সব প্রেমের কোণ
তীরের ফলা, স্বপ্ন নিক।

কবিতা

(রিল্‌কে-কে)

তোমাকে দিইনি আমি সবটুকু মন
আরো দাবি ছিল ব'লে মনের উপর।
সব দাবি মিটে যায় যখন তখন
তোমাতেই ফিরে আসি পাই নিজ ঘর।
আমরা সবাই মিলে কী মধুর স্বর
ঐকতান যেন, জানো, কবিতা আমার ?
না বুঝুক কেউ সেই মেঘ-আড়ম্বর
আমি জানি বজ্র-অগ্নি, শীতলতা তার।

স্থির বিন্দু

(এলিঅট-কে)

একটি স্থির বিন্দুতে যেতে চাই আমি।
আকাশ যেখানে এসে মেশে একটি ঘাসের ডগায়
হাওয়ায় নড়ে না যে ঘাস
তার স্থির বিন্দু যেমন তেমন বিন্দু দাও আমায়
হে আমার মন-পবন !
তুমি স্থির হ'লেই তা পাব
আমার পাবন তা-ই।

র‍্যাঁবোর প্রতি

মেয়েটি কীর্তন গায় তারস্বরে কীর্তনের দলে
ভোর হ'লে আসে আমাদের ছোটো রান্নার মহলে
রানী যেন যদিও সে কুটনোবঁটিতে।
মেশামেশি বাঙালে-ঘটিতে
এ-বস্তির এ-মেয়েটি কী হবে বলো তো, র‍্যাঁবো, ভেবে—
কোন সৈন্যাবাস তাকে নেবে ?

চুম্বক

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমি ছুঁতে চাই কাঠের প্রাণ, আমি ছুঁতে চাই ফুলের প্রাণ, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই যুগে যুগান্তরে।

আমি তোমাকে ছুঁতে চাই হাওয়ায়, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই জলে, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই আলোয় অন্ধকারে, ছুঁতে চাই আমার বেদনায়।

ছুঁতে চাই যেখানে নদীরা মিললো না, ছুঁতে চাই যেখানে নদীরা মিলবে, ছুঁতে চাই যেখানে বৃথাই কেঁদে মরলো মৃত দুর্গের পাষাণ, তবু এগিয়ে এলো না দূরে-স'রে-যাওয়া সমুদ্র।

আমি আমাকে চাই না শোনাতে, আমি আমাকে চাই না দেখাতে, ওগো আমি তোমাকে ছুঁতে চাই, শুধু আমাকে ছোঁওয়াতে চাই যুগ হ'তে যুগান্তরে, প্রাণ দিয়ে প্রাণে।

আর কী-সে দুঃসহ প্রেম যাতে এই ফুল, এই কাঠ, এই প্রাণ-হাওয়া-অন্ধকার আমরা সকলে হলাম একে অন্যের তুমি, সবাই হলাম চুম্বক এই পৃথিবীর অপরিচিতের ভিড়ে।

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কাকতাড়ুয়া

জানি না, ভয় ডানায় আছে কিনা
দুঃস্থ হাত পাথর জড়ো করে,
নগদ দেবো বিদায়ে দক্ষিণা—
সয় না ডাক পাখির, কালোপাখির !

চ্যাঁচায় কেন ? চেঁচিয়ে পাবে কাকে ?
মৃত্যু যদি লুকিয়ে থাকে ডালে
ফলের বোঁটা খসাবে হাঁকডাকে—
মিশিয়ে দেবে ছড়ানো জঞ্জালে !

কী ক'রে হয়। আমার চোখে হাঁটে
হাতটি ধ'রে শিশুর, এলোচুলে
একদা যার বাড়ানো চৌকাঠে
আমিই হবো গৃহস্বামী ভুলে।

তবুও কেন চেঁচিয়ে ওঠে ভোরে
রুগ্ন কাক, কাতর ডানা ঝাড়ে--
সয় না ডাক পাখির, কালোপাখির,
স্বস্তি কই আ-বাঁধা সংসারে।

পূর্বাপর

প্রথমে কিছুই নেই : অনুজ্জ্বল রাত্রি ভ'রে আছে
নক্ষত্রবিহীন স্বপ্নে। মৃতবৎসা গাভীটির ডাকে
দয়ার্দ্র হয়েছে কেউ। আর, আনাচে-কানাচে
নির্ভয়ে জেগেছে নারী হাত-বদলের কোনো ফাঁকে ;
সবাই সন্তুষ্ট, সুখী, বড়োজোর ব্যর্থপ্রেমে গাঢ়,
রেস্তোর'ায় কীর্তিমান, উপলক্ষে জ্যোতির্ময় নেতা—
কিন্তু তাতে কতোটুকু ! তুমি হারো, অথবা না হারো
কোথায় কখন কেন—কেউ আর খোঁজে না প্রণেতা।

পরে সব কাছে এলো। বস্তুত, পাল্টে এলো ব'লে
কন্যার জননী আর ব্যস্ত নন, দূরের আকাশে
আসবাব, গোলাপ, সব ডুবে যায় মগ্ন কোলাহলে—
যেন বৃষ্টি হবে ব'লে, তাড়া নেই ইতর প্রকাশে,
অদ্ভুত, নরম, ধীর, অলস ঘণ্টার গলা ধ'রে
বাষ্পের প্রথম শিশু খেলা করে। খেলার প্রহরে
নির্লোভ শ্বাপদ, কিংবা রুদ্ধকাম মেয়েটির চোখে
অন্য রং নেমে আসে। সবটুকু চায় এক ঢোঁকে ॥

তিনটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাঁশি

বাঁশি-বাজানো আঙুলে আছে বিষ।
আগুনে নয়, আঁধারে নয়, গানে
পল্লবিত প্রেমিক, তুমি জাগো
ফুল-ঝরানো সান্ধ্য অভিমানে।

বুকের বোঝা নামিয়ে এই বেলা
অর্ধমৃত সাপ-নাচানো দেশে
যেয়ো না। তুমি নিভৃত-হওয়া নীলে
মগ্ন থেকো নিজেকে ভালোবেসে।

পথিক, তুমি প্রবাসী ঘরে-ঘরে ;
এই বিষাদে বাজে তোমার বাঁশি :
অমৃত নয়, গরল ; তাই দিয়ো।
প্রেমিক, আমি তোমায় ভালোবাসি।

স্মৃতি

বিষাক্ত স্মৃতি চিরদিন রেখো বুকে ;
যেহেতু তারাই জীবনের যৌতুক।
ঝলকে-ঝলকে রক্ত-ঝরানো মুখে
থাকে যেন কিছু মৃত্যুরও কৌতুক।
স্বপ্নবিলাসী প্রতি মুহূর্তে মরে,
তা নিয়ে দুঃখ কারো নেই দৃশ্যত ;

ঊনপঞ্চাশ বায়ুর আঘাতে, ঝড়ে
পার্থিব সুখে মহাজন হয় হত।
রৌদ্র-নাচানো রঙ্গে, পাগল হাওয়ায়
ধুলোবালি দেয় দু'চোখের দক্ষিণা,
সেই বেদনার আনন্দে দু'বেলায়
প্রেমিক, তোমার স্মৃতিকে করি না ঘৃণা।

নাম

ফুলের নাম বকুল
প্রেমিক তাকে জানে।
তোমার কোনো নাম
নেই তো কোনোখানে।
নদীর জলে ঢেউ
সেখানে এক তান,
বনে হাওয়ার বীণা
সেখানে এক গান।
পথে প্রেমের স্থিতি
পথিক তাকে জানে,
তোমার কোনো নাম
নেই তো কোনোখানে।

হে তৃষ্ণা

তন্ময় দত্ত

পুরোনো চৌকো ধুলোমাখা মুখ কৃষ্ণ স্ফটিক
অবলীন মুখ বিরাগ এড়ায়ে তুষার কাড়ে
জলপথে শোনো কী গভীর গান, জলপথে চলো হাওয়া ঠেলে মুখ
আমরা এখানে নিবিড় জনতা ধুলোমাখা মুখ।

বৃষ্টির পট নেহারি ঝুরেছে শরীর এখানে ত্বরিত ক্ষুর
গরম পাথর লাফালাফি করে মরীচিকা নেই, বালুকা মৃত,
দূরে বৃষ্টির বড়ো-বড়ো চোখ যেন মনে হয় অলীক দেখি
হে তৃষ্ণা, তুমি লোহের স্তূপ কোনোদিন ছেড়ে যেয়ো না চ'লে।

হাত খুলে পড়ে, গোড়ালি ঝরেছে, দূরে হাঁস যেন, গাভীরা চরে
জলে ভাসে দেখ পাহাড়ের রাশি দল বেঁধে দেখ নেমেছে জলে
হাঁটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নেমেছে আকাশ, নিচু হ'য়ে দেখে পাহাড়রাশি
আমার আনন ধূলি-'পরে লোটে, হে তৃষ্ণা, তুমি যেয়ো না চ'লে।

আমি মুখ দেখি হ্রদজলমুখে মাঠের ললাটে পোড়াটে মুখ
পাহাড়ের ঢালে গুরু ধারাপাত বৃষ্টিছায়ায় মড়ক ওড়ে,
পুরোনো চৌকো ধুলোমাখা মুখ অলীক, অলীক স্ফটিক কৃষ্ণ,
তৃষ্ণা, আমায় কিছু প্রাণ দাও, কিছু বেদনায় বাঁচার ভিক্ষা।

আরশি-নগর

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

আরশি-নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে॥

লতাপাতা জামা, চিত্রিত দুটি ভুরু,
সূর্য হাসায় শুপুরির গরিমাকে ;
শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস,
পড়শি আমার উঠলো পটিয়াকে।
(৬-২৯) মনুমেণ্টের নিচে
জনসভা তাকে ডাকে।

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোক উঁচু বাড়িটির চূড়ো,
সাহায্য দরকার।

জলে ভাসে ঘর—সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
গুনতে পারিনে আর।

গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর—কোথায় আরশি তার ?

একটি কবিতা

অর্চন দাশগুপ্ত

রুপালি ওক-এর ফুলে তরাইয়ের উজ্জ্বল সকাল
একটি আশ্চর্য নদী নির্জন নিজেকে মেলে দিয়ে

এখানে থোলস কেন ? নগ্নতায় নির্ভার শরীরে
অত্যন্ত সহজে নামি। জলের উপরে মুখ রেখে
ঠোঁটের আস্বাদ এলো, শিরশিরে এ-নদীর ঠোঁট
অদ্ভুত নরম আর মোলায়েম জলজ আঘ্রাণ,
হাওয়ায় নিশ্বাস কারো, রোমে-রোমে স্রোতের আঙুল
চোখে ঘুম এনে দিলো, অনুভবে অন্য এক নদী :

একদা বলিষ্ঠ রোদে এ-জলের প্রথম প্লাবনে
যে-দুরন্ত তাগাদায় প্রাণগুলি বহুধা হওয়ার
অনিশ্চয়ে ভেসেছিলো, ফিরে এলো জলের আশ্লেষে
হিংস্র হাঙরের মতো স্বাস্থ্যবান শিকারি শরীরে।

আমার সমস্ত শিরা ডুবে গেলো ক্রমশ কখন
বরফের মতো এক আগুনের নীলাভ ঠাণ্ডায়॥

সনেট

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জটিল পাহাড় তুমি বেদনার্ত ঝর্না পাঠিয়েছো ;
দুধারে সবুজ রেখা, আরেক সবুজরেখা জলের ভিতরে
খেলা করে, রুপালি বা রক্তিম মাছের পুঞ্জ, জল স'রে স'রে…
অবিরল বুকে লাগে অবিরল কোথাও শুনেছো ?

জটিল পাহাড় তুমি নদী জাগে নদীর ভিতরে
মগ্ন পান্থজন, তার তরঙ্গিত নখে ছেঁড়ে বেড়ালের মতো
তীর বা বিচ্ছিন্ন কাঁটা, দ্বীপ আর ভাসমান যত
ভোজ্যবস্তু—প্রণয়ী ; সে হাহাকার উন্মোচিত করে।

ঐ মাছগুলি, গুল্ম হৃদয়ের কাছে ছিলো স্মরণীয় কাল—
হৃদয় কর্তাল কোন সুসঙ্গত বনাবেশে নীল মৃদু ক্ষরে
কালো জ্যোৎস্না, আলোকিত কালো জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরে…
তার মগ্ন অন্ধ চলা দৃষ্টিহীন অন্ধ চলা চূড়া ক্ষুব্ধ হাসে—
লালসা বহায় দূরে অতিদূরে অভ্র-উর্ণাজাল
চূড়ার চরণ থেকে স'রে যেতে পারবে না প্রভাসে।

'ল্য ফ্লুর দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

সে-রাতে ছিলাম···

সে-রাতে ছিলাম কদাকার ইহুদিনীর পাশে,
পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ যেন এ ওকে টানে ;
ব্যর্থ বাসনা ; পণ্য দেহের সন্নিধানে
সে-বিষাদময়ী রূপসী আমার স্বপ্নে ভাসে।

মনে প'ড়ে গেলো সহজাত রাজভঙ্গি তার,
দৃপ্তললিতে সে-কটাক্ষের সরঞ্জাম,
গন্ধমদির মুকুটের মতো অলকদাম—
যার স্মৃতি আনে প্রণয়ের পুনরঙ্গীকার।

ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন,—

বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
কোনো সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী !—
ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি।

বারান্দা

প্রেয়সী, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা,
হে তুমি, সর্বস্ব সুখ, বাসনার সর্বস্ব আমার !
মনে কি পড়ে না সেই সোহাগের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
সন্ধ্যার উদার মায়া, অগ্নিকুণ্ডে আতিথ্যবিস্তার,
হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা।

চুল্লির জ্বলনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ !
সন্ধ্যা নামে বারান্দায়, রক্তিম গুণ্ঠনে রমণীয়—
পেলব তোমার বক্ষ, অন্তরে কী অমল কল্যাণ !
কত কথা আমাদের—ধ্বংসহীন, অবিস্মরণীয়—
চুল্লির দহনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ !

কোমল সন্ধ্যার তাপে কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার !
কী গভীর অন্তরীক্ষ ! স্ফীত প্রাণ কেমন বিশ্বাসে !
তোমার আননে ঝুঁকে, ওগো রানী, আরাধ্যা আমার,
মনে হয় তোমার শোণিতগন্ধ পেয়েছি নিশ্বাসে।—
সেদিন, সন্ধ্যার তাপে, কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার !

নেমে আসে রাত্রি, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল,
তোমার চোখের তারা অন্ধকারে আমার উদ্ধার,
নিশ্বাসে তোমার ঘ্রাণ—কী মধুর, তীব্র হলাহল !
ঘুমায় আমার হাতে, ভ্রাতৃভাবে, পা দুটি তোমার
যবে রাত্রি নামে, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল।

জানি আমি মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে,
আমার অতীত, দেখি, তোমার জানুতে রাখে মাথা,
আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে
যদি না তোমারই প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা ?—
জানি সেই মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে !

সেই সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন,
অগম্য গহ্বর থেকে আবার কি জন্ম নেবে তারা,
অতল সিন্ধুর তলে স্নান ক'রে সূর্যের যৌবন

যেমন নূতন হ'য়ে আকাশের প্রান্তে দেয় সাড়া ?
—হায়, সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন !

ভূতে-পাওয়া

আজ কম্বলে আবৃত সূর্যে তোমার মিল।
জীবনের চাঁদ ! তারই মতো মুখে টানলে ছায়া ;
হও ঘুমন্ত, গম্ভীর, মূক, ঝাপসা ধোঁয়া,
বা নির্বেদের অতলে ডুবিয়ে দাও নিখিল ;

তেমনি তোমাকে ভালোবাসি ! তবু, মরজি হ'লে
এসো না বেরিয়ে গ্রহণমুক্ত তারার মতো
প্রগল্‌ভতার প্রলাপ যেথায় বিঘূর্ণিত,
ওঠো খাপ থেকে দীপ্ত ছুরিকা হঠাৎ ঝ'লে !

জেলে নাও ঝাড়লণ্ঠনে ঐ চক্ষুজোড়া !
লুব্ধ চোখের লালসে জলুক বথাটে ছোঁড়া !
আখুটে, অসুখী—যা তুমি, আমার সুখ তাতেই ;

যা-ই হও, কালো রাত্রি অথবা রঙিন ভোর,
আমার কল্প্র তনুতে একটি তন্তু নেই
যা বলে না : "প্রিয় রাক্ষসী, আমি পূজক তোর !"

সান্ধ্য সুর

এই তো সেই লগ্ন, যবে বৃন্ত-'পরে দুলে
প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
গন্ধ আর শব্দ নিয়ে ঘূর্ণমান হাওয়া ;
করুণ ভালুজ্-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে।

প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
করুণ ভালুজ্-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে ;
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া।

বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া।
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া,
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে।

কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া,
কুড়িয়ে নেয় অতীতে যত আলোর কণা জলে ;
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে…
তোমার স্মৃতি আমার বুকে তর্জনীর ছোঁওয়া।

বিতৃষ্ণা

হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।

ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড দেরাজ এক, খোপে-খোপে যার
রয়েছে দলিল, পদ্য, প্রেমপত্র, শস্তা উপন্যাস,
হলুদ রশিদে মোড়া কবেকার দীপ্ত কেশপাশ—
তারও বেশি গুপ্ত আছে মগজের বিষণ্ণ কোটরে।
সে যেন গহ্বর এক, পিরামিড ; বিরাট জঠরে
যত শব ধরে, তত গোরস্থানে কখনো পড়ে না।
—আমি এক আঁধার কবরখানা, চাঁদের অচেনা ;
মূর্ত যেন মনস্তাপ, দীর্ঘায়িত কৃমিরা সেথায়
যে-মৃত আমার প্রিয়, তাকে নিত্য খুঁটে-খুঁটে খায়।

বিবর্ণ গোলাপে ভরা আমি এক জীর্ণ অন্তঃপুর,
সেকেলে কাঁচুলি, জামা ঝুলে আছে বিস্রস্ত, প্রচুর,
আর শুধু করুণ পাস্টেল-চিত্র, দুটি ম্লান বুশে*
অন্তঃসারশূন্য এক করঙ্কের গন্ধ নেয় শুষে।

এই খঞ্জ দিবসের দীর্ঘতায় কে পারে ছাড়াতে—
যখন, তুষারময় বৎসরের হিমার্ত কারাতে
ব্যাপ্ত হয় নির্বেদ—চেতনারিক্ত জড়ের সন্তান—
ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।
—আজ থেকে সপ্রাণ পদার্থ, তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,
পুরাতন স্ফিংস এক সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই, পাশবিক ভঙ্গিমায় তার
ক্ষণিক সূর্যাস্তরাগ গান গায় শুধু একবার।

বিতৃষ্ণা

আমি যেন রাজা, যার সারা দেশ বৃষ্টিতে মলিন।
ধনবান, নষ্টশক্তি, যুবা, তবু অতীব প্রবীণ,
শিক্ষকের নমস্কার প্রত্যহ যে দূরে ঠেলে রেখে,
শিকারি কুকুর নিয়ে ক্লান্ত করে নিজেই নিজেকে।
কিছুই দেয় না সুখ—না মৃগয়া, না শ্যেনচালন,
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।

*ফ্রাঁসোয়া বুশে (Francois Bouchet) : ১৭০৩-১৭৭০। ফরাশি চিত্রকর, সমকালীন অভিজাত-সমাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মনঃপূত বিদূষক প্রহসনে যত গান গাঁথে,
আনত ললাট থেকে রোগরেখা পারে না সরাতে;
ফুলচিহ্নে আঁকা তার শয্যা, তাও নেয় রূপান্তর
কবরে, এবং যায় সাধনায় রাজারা সুন্দর,
জানে না সে-মেয়েরাও, লজ্জাহীন কোন প্রসাধনে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ কঙ্কালের মনে।
করেন কাঞ্চনসৃষ্টি, সে-মুনির মেলেনি সন্ধান
কোন বিষময় দ্রব্যে অহোরাত্রি নষ্ট তার প্রাণ।
এমনকি রক্তস্নান, লিপ্ত যাতে সব ইতিহাস,
পুরাতনী রোমকের, অর্বাচীন দস্যুর বিলাস,
তাও এই মৃঢ় শবে তাপলেশ পারে না জোগাতে,
লিথির সবুজ স্রোত—রক্ত নয়—বহে যে-শিরাতে।

কবর

আজকে তোমার যে-তনুর অভিমান,
কোনো গম্ভীর নিশার অন্ধকারে
দয়া ক'রে এক নোংরা নালার ধারে
তাকে গোর দেবে কোনো সৎখৃষ্টান।

সাধ্বী তারার অধিকৃত সেই ক্ষণে
জ্যোতিষ্কদের চোখেও ঘুমের চাপ
নেমে আসে, আর মাকড়শা জাল বোনে,
বিষাক্ত ডিমে বাচ্চা ফোটায় সাপ।

অভিশাপে সংবিদ্ধ মাথার 'পরে
শুনবে কেবল, সকল বছর ভ'রে
তরক্ষুদের চীৎকার অশ্রান্ত,

কাঁদে আধপেটা ডাইনি বুড়ির গোষ্ঠী
হাবা লম্পট বুড়োর ফষ্টিনষ্টি,
চোর, গুণ্ডার শয়তানি চক্রান্ত।

ধ্বংস

দামাল পিশাচ, নিত্য আমার পাশে
বাতাসের মতো অতনু, সাঁৎরে ফেরে,
তাকে পান ক'রে জ্বালা ধরে ফুশফুশে
শাশ্বত পাপলিপ্সায় যাই ভ'রে।

আমি শিল্পের প্রেমিক, সে-কথা জেনে
মোহিনী নারীর মূর্তি কখনো ধরে,
মজায় অধর অকথ্য অনুপানে
ধর্মধ্বজ নানা ছলছুতো ক'রে।

গাঢ় প্রান্তর, নির্বেদে অফুরন্ত,
সেদিকে ছুটিয়ে করে সে আমাকে ক্লান্ত,
যেথা ভগবান দেন না কখনো দৃষ্টি,

আর বিহ্বল আমার চক্ষু জুড়ে
হানে ধ্বংসের রক্তলোলুপ গোষ্ঠী
কাটা ঘা, পুঁজের নোংরা ন্যাকড়া ছুঁড়ে।

এক শব

কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,
শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে—
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে ?

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষ কীর্ণ,
লজ্জাবিহীন উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে রাঁধবে ব'লে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে ;

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটলো ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছো হঠাৎ ট'লে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে ;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
কৃমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝেঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ফুটে ওঠে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ্য,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

—আর তবু তুমি—তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপংক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা
দেবদূত, সংরক্তি!

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্যকৃত্য সাঙ্গ হ'লে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,
যবে, অস্থির আধারে, নশ্বর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তাহ'লে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

[এই গুচ্ছের কোনো-কোনো অনুবাদের প্রথম লেখন ইতিপূর্বে 'কবিতা'য় বা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিলো।]

ভাষান্তরে আন্তিগোনে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ফাদার রবার্ট আঁতোয়ানকে এই অনুবাদকর্ম উৎসর্গ ক'রে তাঁরই একটি কৌতুকঘন অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি। যদিও এই অনুবাদচেষ্টার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সংলগ্ন ছিলেন, তবু বহুদিন আগে তাঁর মুখ থেকে শোনা 'traduttore tradittore' ব'লে সেই ইতালীয় প্রবাদটি আমি কখনো ভুলিনি। দেখতে প্রায় একরকম এই দুটি শব্দের মধ্যে 'u' এবং 'i'-এর স্বর-বৈষম্য ছাড়া আর কোনো তফাৎ নেই, অথচ ঐ স্বরান্তরের মধ্যেই এমন একটি চূড়ান্ত শ্লেষ লুকিয়ে আছে, যার হুবহু ইংরেজি হ'লো : 'a translator is a traitor'—অনুবাদকমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক। এ-রকম অভিযোগ সত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্য অনুবাদের মধ্যস্থতায় সর্বগ সবার দায়িত্ব নিতে পারে। প্রসঙ্গত, আন্তিগোনে অনুবাদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাই।

গ্রীক সাহিত্যের অগ্রণী শিক্ষকের এই সাবধানবাণী স্মরণীয় : 'হোমারিক গ্রীক ভাষাকে তার অগ্রজা অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যে অনুস্যূত ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রে তাদের ব্যবধান অনুধাবন করো। ধ্বনিমূল্যে অথবা রূপতত্ত্বে সংস্কৃত হ'লো আরো প্রাচীনপন্থী। যে-ভাষাপরিবারে এর জন্ম তার সঙ্গে এর স্বচ্ছ গঠনবৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের অবধানযোগ্য। গ্রীক ভাষার আকর্ষণ অন্যত্র···সে হ'লো গ্রীক মনেরই মূর্তরূপ।' ('The Growth and Influence of Classical Greek Poetry' : R. C. Jebb) তবু প্রতীচী-জগৎ ও হেলেনিক ভাবনার সম্পর্ক কন্যা ও জননীর, এবং প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সংস্কৃতের সম্বন্ধ—উপরের ইঙ্গিতটিকে সম্প্রসারিত ক'রেই বলছি—আন্তিগোনে ও ইস্‌মেনের মতোই সহোদরাবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে আছে। সেই সূত্রটিকে যথাসাধ্য কাজে লাগানোর আয়োজন করেছি। বিশেষত ঋগ্বেদের মন্ত্র সন্নিবিষ্ট ক'রে গ্রীস ও ভারতবর্ষের দূরত্ব সংকুচিত করতে চেয়েছি। এখানে কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করি। দ্বিতীয় কোরাসের প্রথম আন্তিস্ত্রোফের প্রথম

দুই পংক্তিতে আগের স্ট্রোফের শেষ দুই চরণের রেশ রাখবার জন্যে এই মন্ত্রটি রেখেছি :

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং
বিয়ন্ত ॥ (৬-৫১-৫)

(হে পিতা স্বর্গ, মাতা পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ আমাদের প্রসন্ন করো। অদিতির পুত্রগণ ও অদিতি, তোমরা সম্মিলিত হ'য়ে আমাদের পর্যাপ্ত প্রশান্তি দান করো।)

ষষ্ঠ কোরাসের প্রথমে মূলানুগ ভাবাসঙ্গে এই মন্ত্রের ঈষদংশ উদ্ধৃত করেছি :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥
(১-১৬৪-৪৬)

(আদিত্যদেবকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি ব'লে অভিহিত করেন ; সুন্দর পাখায় তিনি গতিশীল। তিনি এক হ'লেও বহুধা ব'লে কথিত হন ; অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামে এঁর পরিচয়।)

বিচলিত ভাবিকথক তাইরেসিয়াসের মুখে এই মন্ত্রটি বসানো হয়েছে :

তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥
(১০-৩৫-১২)

(দেবসঙ্ঘ, তোমাদের প্রতি উদ্দিষ্ট যজ্ঞের সফলতা ইচ্ছা করো। আদিত্যগণ, বিত্তপূর্ণ রাজগৃহ দাও। আমাদের পশু, পুত্র, পৌত্র ও পরমায়ু প্রভৃতি বিষয়ে অগ্নির সমীপে স্বস্তিকল্যাণ প্রার্থনা করি।)

প্রসঙ্গসারূপ্যে, পোলুনাইকেসের মৃতদেহ সৎকারমুহূর্তে আবহ-আবৃত্তির জন্য দুটি শ্লোক সমাহৃত হয়েছে :

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥
উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণাহি ॥
(যথাক্রমে ১০-১৬-৬ ও ১০-১৮-১১)

(হে মৃতজন, কাক শকুন পিঁপড়ে সাপ কিংবা শ্বাপদ তোমার দেহের যে-সব অংশ আহত করেছে, সর্বভুক অগ্নিদেব সেই সমস্ত আঘাত নিরাময় করুন। পৃথিবী, এই মৃতজনকে তুমি যন্ত্রণা দিয়ো না, মর্যাদা দিয়ো। সুখসামগ্রী দিয়ো, সুন্দর প্রলোভন দিয়ো। মা যেভাবে নিজের আঁচলে সন্তানকে সংবৃত করেন, তুমিও তেমনি ওকে আবৃত ক'রে রাখো।)

দ্যুলোকদেবতা জিউস্ কালক্রমে জুপিটারে বিবর্তিত হয়েছিলেন ব'লেই যে প্রথম কোরাসে বৃহস্পতিবন্দনার ত্রিষ্টুপ-স্তোত্রটি (৪-৫০-৪) প্রথম কোরাসের সূচনায় গৃহীত হয়েছে, তা হয়তো নয়। সদ্য-শেষ-হ'য়ে-যাওয়া যুদ্ধের স্নায়ুস্পন্দন নিয়েই কোরাসটির আরম্ভ এবং সূর্যদেবকে সরাসরি স্তোত্রনিবেদন না-ক'রে সূর্যরশ্মিরই উল্লেখ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সারারাত্রির দুর্যোগের পর সেখানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সরল সূর্যপ্রণাম মনস্তত্ত্বসংগত না-হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, বৃহস্পতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দেবগুরু হিসাবে রাত্রির যে-কোনো অংশে আবির্ভূত হ'তে পারেন, এই ধরনের ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁকে আগে এনে পরে সূর্যকে বন্দনা জানানো হয়েছে।

গ্রীক দেবতারা যত কঠোর ততই নমনীয়। 'দেল্‌ফিমন্দিরে থুয়াদ্-দের রোমাঞ্চকর মন্ত্রতন্ত্র একই সঙ্গে আপোলো ও দিয়নুসাসের উদ্দেশে পাঠানো হ'তো ; এঁরা দুজনেই সংগীতজ্ঞ ও দৈবজ্ঞ। থেবাই ও স্পার্তার কোনো-

কোনো অঞ্চলে আপোলোর নামে যে-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো, তা নামমাত্র আপোলীয় এবং বস্তুত দিয়নুসীয়। ক্রেতে দেশে তিনি জিউসের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছিলেন, থ্রাকে দেশে সমর-দেবতা আরেসের সঙ্গে। আর্গোসের পুরাণে প্রোইতোসের কন্যাদের নিয়ে যে-কাহিনীটি আছে, সেটি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা এখনো মনস্থির ক'রে বলতে পারেন নি যে দিয়নুসাস্ ও হেরার মধ্যে কোনজন সেই মেয়েদের উন্মত্ত ক'রে তুলেছিলেন। এই সব অভিজ্ঞান যেখানে চরম সে-সব ক্ষেত্রে আপোলো কি দিয়নুসাস কি হেরা সবাই স'রে যান, আদি কৌমসমাজের ছন্দোময় ব্রতপার্বণ আস্তে-আস্তে আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।'

('Æschylus And Athens' : George Thomson)

একাধিক স্থলে জিউস্ বা আরেস্ বা দিয়নুসাস্‌কে তাই আঞ্চলিক দুর্গমতা থেকে সরিয়ে এনে অনুষঙ্গে সদৃশ কোনো-কোনো ভারতীয় দেবতার পাশাপাশি বসিয়েছি। এ-ভাবে পাশাপাশি বসালে দুটি নামের সান্নিধ্যে সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইষ্টার্থ সাধিত হয় এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের অভিন্ন আকাশের নিচে মিলিত হ'তে পারে।

আমার উক্তির সমর্থনকল্পে ইন্দো-গ্রীক রাজাদের দুটি মুদ্রার বিবরণী পর-পর এখানে তুলে দিয়ে পাঠকদের উপরে এর সম্ভাবনা-বিচারের ভার অর্পণ করতে চাই :

১। দ্বিতীয় দিয়দিতাস্, ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা (২৪৫-২৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)
স্বর্ণমুদ্রা। ১৩০ ভাগ সোনা। সামনের দিকে রাজার নিটোল মুখাবয়ব।
উল্টোদিকে : বাঁ দিকে লম্বা পা ফেলে নগ্ন জিউস্।
ডান হাতে সজোরে বজ্রায়ুধ নিক্ষেপ করছেন।
বাঁ হাতে ঢাল ; বাঁপায়ের কাছে একটি ঈগল।
বাঁ দিকে মালা। মুদ্রালেখ ডানদিকে।

২। রৌপ্যমুদ্রা—আমুন্তসের মুখ : (আমুন্তস ৮৫-৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ?)
সামনের দিকে : শিরস্ত্রাণসজ্জিত আমুন্তসের আবক্ষ মূর্তি ডানদিকে

তাকিয়ে ; উল্টোদিকে : সিংহাসনে জিউস্, পাল্লাস্ দেবীকে প্রসারিত ডান হাতে ধ'রে আছেন ; বাঁ হাতে রাজদণ্ড ও পাম গাছের পাতা। উপরে মুদ্রালেখ এবং নিচে আমুন্তসের নাম।

(প্রথমটির নিশানা : V. A. Smith P. 7 Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta.
দ্বিতীয়টির নিশানা : কাবুল মিউজিয়মে রক্ষিত ; এবং A. K. Narain-এর The Indo-Greeks বইয়ের শেষের দিকে পঞ্চম চিত্রফলকে মুদ্রিত)

গান্ধারশিল্পের মধ্যে গ্রীক শিল্পরীতি যে-অর্থে অনূদিত হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত দুটি মুদ্রা-পরিচয় সেই অর্থে গ্রীক দেবতাদের নবজন্ম ঘোষণা করছে না ; বরং মনে হয় প্রথম ছবিতে দিবস্পতি ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এবং দ্বিতীয় ছবিতে প্রজ্ঞাময়ী নগরলক্ষ্মী পাল্লাস্ দেবীকে তিনি যে ধ'রে আছেন, ভারতবর্ষীয় দেবদেবীর একান্ত পরিচিত মূর্তির সহযোগিতায় তাও চোখে লাগে না। গ্রীক দেবমণ্ডলেই এ-রকম সম্ভাবনা নিহিত ছিল এবং তাই উরেনাস্-ক্রোনোস্-জিউস্—এঁদের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব আছে। একজনের পর একজন আসছেন, রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর বৈশিষ্ট্য বাড়ছেই। এ-কথা মনে রেখে জিউসের পাশে, অবস্থা অনুযায়ী বিষ্ণু বা আদিত্য বা অন্য দেবতাকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ হয়েছে। বেদে বিষ্ণুর যে-বর্ণনা আছে সেটি প্রধানত আদিত্য-বর্ণনা, এবং এই রকম আরো কয়েকটি সম্ভাব্য সাদৃশ্যের সূত্র নিয়ে ইন্দ্রের পাশে আরেস্, বা অন্তত্র পাশে এরোস্‌কে এনেছি। অবশ্য সর্বত্রই যে এই রকম অঙ্গাঙ্গী সন্নিবেশ করিনি, সে-কথা বলা বাহুল্য।

'আর্গোন' বা ঘটনাগতির সঙ্গে 'মুথোস' বা বিবৃতি গ্রীক নাটকের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিবৃতির ও নাটকীয় ঘটনাবেগের মধ্যে 'কোরাসে'র কাজ

সবচেয়ে দরকারি। 'সাপ্লিকেস্' ও 'ইউমেনাইদেস' নাটকে ঈস্‌কাইলাস্ গীতি ও গতির পরিণয়সাধন করেছেন তাতে এক-এক সময় বোঝার উপায় থাকে না, কার প্রাধান্য বেশি আর কার কম। সোফোক্লেস্ সেই দিক থেকে আরো সচেতন এবং সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরবপন্থীদের সমবেত সংগীত ও বাউলের গানের সঙ্গে আখ্যান-ঘটনার আশ্চর্য টানাপোড়েন স্মরণীয় এবং তুলনীয়। 'তাই আন্তিগোনের ছয়টি সমবেত সংগীতের ক্রমান্বিত বিষয় হ'লো আর্গবাসীর আক্রমণে থেবা নগরীর অতীত দুর্যোগ; আইমোনের মধ্যবর্তিতায় উদ্‌ঘাটিত প্রেমের শক্তি; দানাএ, লুকাউর্গোস্ ও ক্লিওপাত্রার কারাভোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতিতুলনা ক'রে দেখানো যে পাথরে তৈরিকবর আন্তিগোনের জন্য অপেক্ষা করছে; সহৃদয় দেবতা দিয়নুসাসের কাছে তাঁর প্রিয় থেবা নগরীর প্রতীক্ষিত জয়োল্লাসে যোগদানের জন্য উদ্বেল প্রার্থনা···প্রত্যেকটি কোরাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সেই-সেই নাটকীয় মুহূর্ত টল্‌মল্ ক'রে উঠেছে।'

(R. C. Jebb. 'The Growth and Influence of Classical Greek Poetry.')

এই 'কোরাস' গানগুলির ভাষান্তরকালে 'choral ode' শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম। 'সম্মেলকসংগীত' 'সমবেত ধ্রুবপদ' 'বৃন্দগান' 'চারণগীতি' ইত্যাদি অনেক শব্দ প্রলোভিত করেছিল। 'Harmony'র প্রতিশব্দে রবীন্দ্রনাথ 'সংধ্বনিসংগীত' ব'লে যে-অর্থময় শব্দটি গ্রহণ করেছেন তা এখানে কাজ করলো না। সুতরাং choral ode-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে 'সংস্তব' কথাটি একটু দুঃসাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। এই দুঃসাহসের তথ্যভিত্তি নীচের শ্লোকাংশ :

'স্তুতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ' (মহাভারত, দ্রোণপর্ব)

Strophe-র সমার্থবহ শব্দ হিসাবে সামগানের 'স্তোভ' শব্দটি প্রথম প্রলোভন হয়ে এসেছিল, কেননা নিয়তির সঙ্গে ঐ শব্দের একটা যোগ আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাগসংগীতের দুটি পরিভাষা গ্রহণ ক'রে 'strophe'-র জায়গায় 'স্থায়ী' ও 'antistrophe'র জায়গায় 'অন্তরা' প্রয়োগ করেছি। 'স্থায়ী

অংশে গানের প্রকৃত প্রস্তাবনা হচ্ছে এবং অন্তরা অংশে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে ও তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে।' (অমিয়নাথ সান্যাল : 'প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা')

বিষয় বা বিন্যাসে গ্রীক নাটকের তন্ত্রীসংখ্যা ও তন্ত্রীসংকেত সুরশূদ্ধার যন্ত্রের মতোই, সাধারণত গম্ভীর, সংবৃতবাক্ এবং উঁচু পর্দায় বাঁধা। তার ছন্দ অমিত্রাক্ষর হ'লেও তার ভাষা লৌকিক হ'তে ভয় পায়। 'সোফোক্লেসের ভাষা যখন অত্যন্ত ঋজু, তখনো রূপকধর্মী। তবু তিনি পিণ্ডার বা এলিজাবেথানদের মতো যুবজনোচিত উৎসাহে শব্দের ঝুলি দিয়ে কাজ চালান না, হাতে-হাতেই বীজ বোনেন।···তাঁর মুখ্য পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে কিংবা দূতদের সংবাদ পরিবেশনের সময়ে বর্ণনার্ধর্মিতার প্রয়োজনে আরো অলংকৃত ভাষা আশা করা অন্যায় ছিল না। কিন্তু কথোপকথনের ধর্মই সে-সব ক্ষেত্রে প্রকট। (F. J. H. Letters : The Life and Works of Sophocles)। সংস্কৃত নাটকের মতো গ্রীক নাটকে প্রাকৃতের কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই, সুতরাং সব চরিত্রই সেখানে একটি সমোত্তল জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাই স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি, তদ্ভব ও তৎসম এক জায়গায় এনে সময়বিশেষে চলতি প্রবাদজুড়ে দেওয়া অসংগত মনে করিনি। 'Stichomythia' বা এক-এক চরণে নিবদ্ধ দ্রুত সংলাপচালনা—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঈস্‌কাইলাস্' বইটিতে এর বাংলা করেছিলেন 'কথা-কাটাকাটি'—আন্তিগোনে নাটকেরও একটি আকর্ষণস্থল, এবং অনুবাদকালে বুঝেছি লেটার্সের 'হাতে-হাতে বীজ বোনা'র তুলনাটি কতো অব্যর্থ।

কথোপকথনে মূলের পংক্তিসংখ্যা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দু-এক পংক্তি বেড়েছে বা কমেছে।

গ্রীক স্থান ও পাত্রের নাম অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কখনো-কখনো শ্রুতিশোভনতার খাতিরে অদলবদল যে হয়নি এমন নয়।

এ-নাটকের উপসংহারে 'কোরাসে'র সংলাপ মাত্র ছয় ছত্রে সমাপ্ত। খসড়ায় সেখানে পর-পর এই তিনটি ঋক্‌মন্ত্র সংলাপের ফাঁকে-ফাঁকে দিয়ে ঐ মিতকথনের আপাতদৃষ্ট অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলাম :

(১) তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ (৩-৬২-১০ ঋগ্বেদ)

(২) যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে
চিৎসন্তলি দিবাতি রোচসে।
রাত্র্যাশিদদ্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে
মা রিষামা বয়ং তব (১-৯৪-৭)

(৩) আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি॥ (৮-৬-৩০)

আমার মনে এই ঋক্‌যোজনার পটভূমি ছিলেন সম্ভবত ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তধারা'র উল্লেখ আবার করছি। 'আন্তিগোনে' নাটকে দুই শ্রেয়োবোধের সংঘর্ষের মতো 'মুক্তধারা'তেও রণজিৎ বিভূতি ও অভিজিতের মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার অভিজিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তিমে যে 'পরমা নিষ্কৃতি' (catharsis) হ'লো তাকে দৃঢ় করবার জন্য ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'চিরকালের মতো পেয়ে গেলি' কথাটির পরেও ভৈরবপন্থীর 'জয় ভৈরব, জয় শংকর' গানটির দরকার ছিল। অথবা 'নটীর পূজা'র কথা ওঠে। এর উপসংহারে শ্রীমতীর গান ও ভিক্ষুকদের গান, অস্মিতার বিষাদ ও মুক্তকণ্ঠ নৈর্ব্যক্তিকতা রত্নাবলীর তিন চরণের বুদ্ধশরণমন্ত্রে এসে যে-ভাবে সংহত অথচ অকূল সমুদ্রে মিশে গেছে, তার সুদূরতম আভাসও যে 'আন্তিগোনে'র উপাস্ত্যে অসম্ভব ছিলো এ-কথা মানতে পারি না। কিন্তু তা হ'লে এ আর গ্রীক নাটক থাকতো না। গ্রীক নাটকের শেষে আঘাতের পর আঘাত আছে, নিপীড়নের পর নিপীড়ন, তারপর আর মুখ ফুটে বেশি কথা বলার সামর্থ্য অথবা সেই দুর্বিপাক শান্ত রসে উত্তীর্ণ করার উপায় থাকে না। অঙ্কের শেষদিকে কোরাসকে রেখে সেনেকা যে-ভাবে তাকে স্বতন্ত্র করেছেন ও ঘটনাপ্রবাহের উপরে তার অনধিকার জারি করেছেন, সোফোক্লেস যে সেই অর্থে তাকে অক্ষম করেছিলেন তা নয়। নাটকীয় অভিঘাতের প্রয়োজনে এমন ঘটেছে। রাসীনের 'আথেলিয়া'র শেষটুকু (৫।৮) দেখে আবার সোফোক্লেসের উদ্দেশ্য বুঝেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে 'আন্তিগোনে'র শেষ দৃশ্যে মন্ত্রশান্ত পরিবেশ আরোপ করার অন্যায় প্রলোভন থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

আন্তিগোনে

—সোফোক্লেস—

মঞ্চে উপস্থিত পাত্রপাত্রী

আন্তিগোনে	থেবা নগরীর মৃত রাজা ও রানী ঈদিপাস ও জোকাস্তার কন্যা
ইসমেনে	তার সহোদরা
ক্রেয়োন	তাদের পিতৃব্য, বর্তমানে থেবা নগরীর একচ্ছত্র শাসক
আইমোন	তার সন্তান আন্তিগোনের দয়িত
তাইরেসিয়াস	একজন অন্ধ ভাবিকথক
একটি বালক	তাঁর সঙ্গী
ইউরুদিকে	ক্রেয়োনের রানী, আইমোনের মাতা

ক্রেয়োনের একজন পার্শ্বচর
একটি প্রহরী
অন্যান্য প্রহরী ও পার্শ্বচর
থেবা নগরীর পনেরোজন প্রবীণ ব্যক্তির একটি সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে একজন সূত্রধার।

(প্রথম অভিনয়: আনুমানিক ৪৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, যখন সোফোক্লেসের বয়স অন্তত পঞ্চান্ন।)

দৃশ্যস্থল: থেবা নগরীর নতুন রাজা ক্রেয়োনের প্রাসাদপ্রাঙ্গণ। সদ্য উষার আলো এসে পড়েছে। আন্তিগোনে ইসমেনেকে আকর্ষণ ক'রে একপাশের দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করলো।

আন্তিগোনে

ইসমেনে শুনেছিস, ইসমেনে, বোন রে আমার!
ব'লে দে এ-ভাবে আর কত ঋণ শুধে দিতে হবে
দেবতাকে, যে আমাকে আর তোকে পুতুল নাচায়,
তোকে আর আমাকে যে মরণকালের আগে মারে!

বলতে পারিস কোন্ দুঃখ কোন্ দৈবদুর্বিপাক
বাকি আছে ? কিংবা কোন কলঙ্কের ক্লিন্ন অপমান ?
হায় ঈদিপাস মোরা বয়ে মরি বিষবৃক্ষফল।
আর তুই শুনেছিস সিংহাসনে নতুন রাজার
নতুন বিধান ? না কি কানা মেয়ে তুই কালা মেয়ে
প্রিয়জন যাক তবু দেখবি না, শুনবি না কিছু ?

ইসমেনে

তোমায় মিনতি করি, একবার শোনো আন্তিগোনে
এর মধ্যে শুনিনি তো বাইরের নতুন জোয়ার
কার পাড় ভাঙে, কার ঘর গড়ে, কিছুই বুঝিনি,
হঠাৎ যেদিন গেল দুই ভাই একেবারে চ'লে
আত্মঘাতী যুদ্ধ ক'রে, তারপর কিছুই জানি না।
শুধু জানি কাল রাতে, একরাত্রে, আর্গবাসী যত
ছত্রখান হয়ে গেছে, তারপর কিছুই জানি না।

আন্তিগোনে। তা আমিও জানতাম, তাই তোকে সবার আড়ালে
এখানে এনেছি ডেকে চুপি-চুপি কিছু বলবো ব'লে।

ইসমেনে। কী জানি তুমি কী বলবে, ভাবনা যেন তোমার ভুরুতে
গুরুগুরু কেঁপে ওঠে দুর্ভাবনার কালো মেঘ।

আন্তিগোনে। আমাদের দু'ভায়ের কথা বলি, ক্রেয়োনের আদেশ
এক ভাই রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হবে,
অন্য ভাই পাবে না সে অধিকার। এতেয়োক্লেসের
শবদেহ রাখা হবে মৃতদের রাজার মতন,
কিন্তু কী মর্যাদা পাবে আমাদের পোলুনাইকেস ?
মৃত্যুর পরেও তার শান্তি নেই পথে রইবে প'ড়ে ?
কেউ তাকে এককাঠা কবর কি একফোঁটা জল
দিতে পারবে না, ব'লে দিয়েছেন, মহান ক্রেয়োন।

তার মানে ওরে ভাই আমাদের পোলুনাইকেস
তুই শুধু খরচক্ষু শকুনিপাখির ভালোবাসা,
খরোষ্ঠী শকুনি পাখি তোর দেহ চিরে-চিরে খাবে
তোর আর আমার জন্য এ-আদেশ। ঐ যেন রাজা
এখনি এলেন ব'লে আদেশের মর্ম জানাতে ;
যে নাকি অমান্য করবে, তাকে তিনি ইহলোক থেকে
স্থানান্তরে পাঠাবেন, ঢিল ছুঁড়বে রাস্তার মানুষ
তার গায়ে, তোর গায়ে কেমন বিঁধছে এ খবর,
জানতে চাই, জানতে চাই দিবি তোর জন্মপরিচয়,
রাজার ঝিয়ারি, নাকি দাসের ঘরের বাঁদি তুই !

ইসমেনে। এই যদি হয় তবে আমার কী করার রয়েছে ?
আমি কে বাধা দেবার, কেবা আমি বাধা ভাঙবার ?

আন্তিগোনে। শোনো তুমি এই কাজে সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে পারবে ?

ইসমেনে। কোন কাজে ?

আন্তিগোনে। মৃতদেহ তুলে ধরতে হবে, মৃতদেহ
তুলে ধরবার কাজে হাতে-হাতে সাহায্য করবে।

ইসমেনে। কী, তুমি কবর দেবে তাকে ? তুমি রাজাজ্ঞা মানবে না ?

আন্তিগোনে। সে আমার সহোদর, আশা করি তোমারো সে ভাই,
বেআইনি হ'তে যদি ভয় করো, ভ্রূক্ষেপ করি না।

ইসমেনে। ক্রেয়োনকে মানবে না ? তুমি কি পাগল হ'লে ?

আন্তিগোনে। আমি
আমাকে মানতে চাই, তিনি কেন হাত দিতে যান ?

ইসমেনে। মনে ভাবো আন্তিগোনে মোদের পিতার সর্বনাশ ;
কী ক'রে গেছেন তিনি জন্মের মতন শেষ হ'য়ে,
নিজের কাছেই নিজে সাব্যস্ত করুন অপরাধী

ঘৃণিত, অসম্মানিত, হৃতদৃষ্টি ; তাঁর দুটি চোখ
নিজেরি দুহাতে উপড়ে নিয়েছেন তিনি, আর যিনি
একসঙ্গে তাঁর জায়া ও জননী, তিনি গাঁঠছড়া খুলে
ফাঁস প'রে অসময়ে ফেলেছেন শেষ নিশ্বাস।
মনে ভাবো আমাদের অসুখী দু ভাই—দুই ভাই।
ছারখার হয়ে গেছে আত্মঘাতী যুদ্ধের আগুনে।
আজ ছাখো আমরা দুজনা এক, রাজার বিধান
না মানলে আমাদেরো পরিণাম তাদেরি মতন।
আমরা দুজনা একা, আন্তিগোনে, মোরা শুধু নারী,
আমরা শুধু যে নারী, পুরুষের সঙ্গে পারবো না,
আমরা তাদের প্রজা, সর্বসহা, ধৈর্যমাত্রসার,
যারা পরলোকগত সবাকার ক্ষমা চেয়ে আমি
জীবিত প্রভুর কাছে ছায়ার মতন অনুগত ;
সাধ্যের বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে যে মূঢ়তা !

আন্তিগোনে। অনেক হয়েছে, থামো। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন
তোর সহায়তা চাই না, শুভেচ্ছার প্রয়োজন নেই ;
আমার ভাইকে দেবো সমাধির শান্তি, সেইজন্য
মৃত্যু যদি প্রয়োজন হয় ; তা-ও ভালো, তাই ভালো।
যাকে ভালোবাসি আমি তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।
সে-মৃত্যু মহতী। যাকে ভালোবাসি সেও ভালবাসে ;
আমি তো মাটির নিচে মরণের পরে চিরকাল
বাস করবো, তবে কেন মাটির উপরে যারা আছে
তাদের হুকুম শুনবো ? তোমার যা অভিরুচি, করো,
যত ইচ্ছা ঘৃণা করো পবিত্র যা ঈশ্বরের কাছে।

ইসমেনে। ঘৃণা তো করিনি আমি, শুধু বলি সে-শক্তি সে-মেধা
একেবারে নেই যাতে রাজশক্তি অবহেলা করি।

আন্তিগোনে। আত্মপক্ষসমর্থন তুমি জানো, আমি তা জানি না,
আমি জানি একমাত্র যাকে ভালোবাসি তার ব্রত।

ইসমেনে। অসুখী, অভাগী ওরে, ভয় করে, বড়ো ভয় করে।

আন্তিগোনে। ঘোরাও নিজের চাকা, আমি থাকি ভাগ্যচক্র নিয়ে।

ইসমেনে। ঘৃণাক্ষরেও তবে বোলো না তোমার এই কথা
কোনো মানুষের কাছে, আমিও কারোকে বলবো না।

আন্তিগোনে। যাও যাও ব'লে দাও আবালবৃদ্ধবনিতাকে,
যে-সৎসাহস থাকলে তোকে আর ঘৃণা করবো না।

ইসমেনে। আগুন তোমার বুকে, বরফ তোমার কাজে।

আন্তিগোনে। তাই
তর্পণের কাজে লাগে, স্বর্গতের আশীর্বাদ পায়।

ইসমেনে। এ এক অসাধ্য যজ্ঞ, এ-আগুনে হাত পুড়িয়ো না।

আন্তিগোনে। তবুও জোগাবো আমি আমরণ হোমের সমিধ।

ইসমেনে। আলেয়া তোমার লক্ষ্য, জেনে-শুনে কেন ভুল করো ?

আন্তিগোনে। তুমি কি এখনো থামবে ? কেবল আমার ঘৃণা নয় ;
মৃত মানুষের তীব্র ঘৃণার বিষয় হবে তুমি,
মৃতদের ঘৃণা ঢের দীর্ঘস্থায়ী। আমি অজ্ঞতার
অন্ধকারে ডুবে মরি, যত অন্ধকারে ডুবে মরি
আমার নিয়তি মোর, সে-মরণ মহতী মরণ।

(আন্তিগোনের নিষ্ক্রমণ)

ইসমেনে। যাও, যদি যেতে হয়, ঋজুপথে মূর্ত একাগ্রতা,
ও যে ভালোবাসে, ও যে নিজেই একাগ্র ভালোবাসা।

(ইসমেনের নিষ্ক্রমণ)

সূর্যের আলো সমস্ত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছে। থেবা নগরীর
পনেরোজন প্রবীণ ব্যক্তির প্রবেশ ও সংস্তব-গান।

স্থায়ী : এক

বৃহস্পতি প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমো ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো থেণ বি সপ্তরশ্মিধমৎ তমাংসি ॥
সূর্যকিরণ, নমো ভবন্ত এমসি।
থেবা নগরীর সপ্ততোরণে এ কী বিচিত্র রশ্মির আয়োজন,
নবহরিদ্রা দির্কা নদীতে ঝরে বালার্কবর্ণ আলিম্পন।
আর্গোস হ'তে এসেছিল তার ভীষণ অশ্ব-'পরে
শাদা ঢাল হাতে দারুণ দস্যু, তাকে এই সমতল
হ'তে তুমি দিলে চিরনির্মূল ক'রে।
পোলুনাইকেস এনেছিল শত্রুতা,
ফেনিয়েছিল সে নদীর শান্ত জলে,
চোখে-মুখে তার তুষারপক্ষ শ্যেনপক্ষীর ক্ষুধা,
মেঘে-মেঘে বড়ো তুলেছিল কোলাহল,
কোথা গেল তার শাদা ঢাল হাতে ঘোড়ার কেশরে সজ্জিত সেনাদল!

অন্তরা : এক

মোদের পিতৃপুরুষের এই ভিটা,
সপ্তদ্বার এই যে মহানগরী,
রক্তপায়ী সে ফিরেছিল সঞ্চারি,
তার দুহাতের মশাল সে যেন চিতা,
রাজমুকুট যে চেয়েছিল ঝলসাতে!
পালিয়ে গিয়েছে ইহলীলা সংবরি'।
সে-ভীষণ রণ হ'য়ে গেছে কাল রাতে,
যেন সে ড্রাগন নিয়ে এসেছিল সরীসৃপের শঙ্কিল শর্বরী।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততং।

হিরণ্যাক্ষ দ্যুম্পিতা জয় জয়,
তাঁরি সম্পাতে নদী হ'লো সোনারং,
বিজিত সৈন্য গেল সন্তরি, ক্যাপানাস্ গেল রোষবহ্নিতে মরি' ॥

স্থায়ী : দুই

দুর্ভাগা ও যে জীবন্তমৃত তান্তালসের মতো
প্রথমে শূন্যে উদ্বন্ধনে, আর শেষে গেল প'ড়ে,
প্রতিধ্বনিত কম্পিত মাটি; নাকি সে মদনাহত
অলাতচক্রী মথিতমদিরা ঘোরে
বিদ্বেষ নিশ্বসি'।
ইন্দ্রসমান আরেস্ তখন পাপীকে শাস্তি দিতে
উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গে যেন মুখরিত চারিভিতে,
বিজিতপক্ষে নিয়তি তখন কৃষ্ণাচতুর্দশী।

সপ্ততোরণে সাতজন সেনাপতি
বিসর্জি' প্রাণ, অশ্বারোহীর অসি ও বর্ম ছেড়ে
উৎসর্জিল দ্যুম্পিতা নামে সর্বাধিনায়কেরে;
শুধু দুইজন, এক জননীর জঠরের সন্তান
অসিযুদ্ধের বিনিময়ে নিল পরস্পরের প্রাণ,
এখন যমজ, কেননা তাদের এক মরণেই গতি।

অন্তরা : দুই

ওড়ে যে আবার বৈজয়ন্তীমালা
আকাশচুম্বী থেবাই রথের চূড়ে,
ভুলব অতীত, আসে তো আসুক অতীতের যতো জ্বালা
ঘন সুপ্তিতে দুঃস্বপ্নের ক্ষুব্ধ অশ্বক্ষুরে।
আজ মোরা খুঁজি পবিত্র বেদী মঙ্গলকল্যাণে,
সারা বিভাবরী ভ'রে ওঠে তারি বৈতালিকের গানে,

থেবা নগরীর ধরণী যেজন কাঁপায় সুরের টানে,
কিশোর নায়ক ব্যাকাস্ জাগুক আমাদের মাঝখানে।

সূত্রধার

গান সারা হোক, এলেন রাজাধিরাজ,
মেনইকিসের কুমার ক্রেয়োন ঐ,
অর্পিল বিধি সুকঠিন রাজকাজ
ক্রেয়োনের হাতে। তিনি আজ নিশ্চয়ই
আমাদের কাছে যুক্তির সন্ধানে
এসেছেন, মোরা রাজার সুধীসমাজ।

দুজন দেহরক্ষী নিয়ে সম্পূর্ণ রাজবেশে ক্রেয়োন প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন।

ক্রেয়োন

প্রাতঃপ্রণাম নিন সুধীবৃন্দ, সবি তো জানেন
আমাদের রাজ্যতরী রাষ্ট্রতরী অকূল পাথারে
ভেসে প্রায় ডুবে যেতে গিয়েছিল, কোনোক্রমে বেঁচে
তলানির কাঠমাত্র নিয়ে আজ ফিরেছে ডাঙায়;
আপনারা বিচক্ষণ, নিশ্চিত জানেন কেন তবে
ডেকে পাঠিয়েছি। আজ আপনারা আমার নির্ভর,
যেমন ছিলেন যবে সিংহাসনে অখণ্ডপ্রতাপ
রাজা লাইয়স, আর তারপর যবে ঈদিপাস
অধিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যে। ঈদিপাস যাবার পরেও
আপনারা স্থির সঙ্গী তাদের উত্তরপুরুষের;
কিন্তু তারা, শেষ দুটি বংশদীপ, তারাও যখন
পরস্পর সহোদর হত্যার নির্লজ্জ কালো রাতে

মুছে গেছে, সুতরাং একমাত্র নিকট আত্মীয়
ব'লে আমি রাজদণ্ডের যোগ্য উত্তরাধিকারী।
বেশ, এ তো ভালো, এ তো স্বাভাবিক, রাজশক্তি তবু
কোনো মানুষের শক্তি যতদিন পরীক্ষা না করে
সেই মানুষের শক্তি ততদিন প্রমাণ হয় না।
যদি কোনো রাজার কুমার হয় রাজার দুলাল
কখনো বলে না স্পষ্ট কখনো থাকে না স্পষ্ট পথে,
নরাধিপ নাম হোক, তাকে আমি নরাধম বলি।
যার কাছে রাজ্যের চেয়েও বন্ধু বড়ো, আমি তাকে
মানুষের অন্তর্গত পৃথিবীতে গণ্যই করি না।
সর্বদর্শী সত্যদর্শী বিধাতার নাম নিয়ে বলি
যে-মুহূর্তে টের পাবো কালসাপ ঢুকেছে নগরে,
বাক্‌সংবরণ ক'রে থাকবো না। আমার স্বজন
স্বদেশের শত্রু হ'লে দণ্ড দিতে দ্বিধা করবো না।
কে না জানে এদেশ আমার আমাদের ভাগ্যতরী,
তারাই যথার্থ বন্ধু যারা পাটাতনে বসলেও
টলমল করে না তরী, পারাবার পার হ'য়ে যায়।
এ-সত্য বুঝেছি, তাই সত্যের পথের বিঘ্ন মুছে
পার হবো; এ-আদেশ মৃত ব্যক্তিকেও ছাড়বে না।
বীর যে এতেয়োক্লেস্, লড়েছিল এদেশের হ'য়ে,
এই নগরীর পক্ষে আমরণ যুদ্ধ করেছিল,
ধন্য যে এতেয়োক্লেস—তাকে যেন যত নাগরিক
স্রক্‌মাল্যচন্দনে সযত্নে সমাধি দেয়, আর
গভীর সম্মানে তার শোকগাথা উচ্চারণ করে।
অন্য একজন, সেই দেশদ্রোহী পোলুনাইকেস,
নির্বাসিত দুর্জন সে, দেশে ফিরে পিতৃপুরুষের

গৃহদেবতার যত সোনার বিগ্রহ নষ্ট ক'রে
স্বজনের রক্তে তার পিপাসা মেটাতে চেয়েছিল,
সকলকে দাসবংশে পরিণত করতে চেয়েছিল,
শোনো সব দেশবাসী, যেন পাপী পোলুনাইকেস
না পায় সায়ংকৃত্য, না পায় মৃত্যুর রাজকর,
সমাধি দিয়ো না তাকে, একবিন্দু অশ্রুও দিয়ো না,
তার দেহ ফেলে রেখো কুকুর শকুনি খেয়ে যাক।
এ-বিষয়ে এ আমার শেষ কথা, আমার রাজত্বে
সুজন শয়তান আমি এক আসনে বসাতে পারবো না।
যে শুধু দেশের জন্য সব দিল, জীবিত হ'লে সে
উপঢৌকন পাবে, মৃত হ'লে শহীদ সম্মান।

সূত্রধার। মেনইকিস স্বর্গগত, তাঁর যোগ্য সন্তান ক্রেয়োন
তোমার আদেশ রাখো শত্রুমিত্র সবার উপরে,
তোমারি তো অধিকার নির্বিশেষ নীতিরচনার,
যারা ম'রে গেছে যারা বেঁচে আছে সবার উপরে।

ক্রেয়োন। দেখবেন যা বলেছি অন্যথা না হয় যেন তার।

সূত্রধার। এ-কাজে দরকার অল্পবয়সের একজন লোক।

ক্রেয়োন। ইতিমধ্যে একজন মৃতদেহ পাহারার কাজে
নিযুক্ত হয়েছে।

সূত্রধার। তবে বাকি আর কী কর্তব্যভার ?

ক্রেয়োন্। আইনবিরুদ্ধ কণ্ঠ শুনলেই রোধ করবেন।

সূত্রধার। কে আছে এমন মূঢ় মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করে।

ক্রেয়োন্। মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভুল আদর্শের টানে
স্বপ্নচারী কেউ-কেউ মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে যায়।

একটি প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ, এ কথা বলবো না : 'আমি শ্বাস বন্ধ ক'রে

ছুটে আসছি একটানা, একটুও থামিনি।' সত্যি কথা
বলতে গেলে মনে-মনে হুঁচট খেয়েছি বারবার,
পায়ের গোড়ালি যেন বারবার টেনে ধরছিল,
বুক ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে বলছিল : 'সাঙাৎ, ডুববি,
অমন চৌদূনে গেলে ডাইনে-বাঁয়ে দেখে শুনে চল,
ব্যস্তসমস্ত কেন ? কপালে তো দুর্ভোগ আছেই।
আবার থামলি কেন ? জোর চল। অন্য কারো কাছে,
ক্রেয়োন এ-কথা শুনলে পিঠে তোর থাকবে না ছাল।'
এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘামতে-ঘামতে ছোটো পথটাকে
বড়ো পথ ক'রে নিয়ে পৌঁছতে ভীষণ দেরি হ'লো ;
এবার আপনাকে সব বলি, কিন্তু কী ক'রে যে বলি,
যা-ই বলি ভাগ্য যেন হতভাগা করে না আমাকে।

ক্রেয়োন। কিন্তু কী এমন কথা, যার এত ভয়ানক ভার ?

প্রহরী। মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, সবিনয়ে বলি
সে-কাজ করিনি আমি, কিংবা যার করা সেই কাজ
তাকেও দেখিনি, তবে আমি কোনো শাস্তি পাবো না তো ?

ক্রেয়োন। চালাকচতুর বটে, কথা সাজাতেও বেশ জানো,
শাদা কথা বলো দেখি, খারাপ খবর আছে কোনো ?

প্রহরী। খারাপ খবর, তাই বলতে গিয়েও পারছি না।

ক্রেয়োন। ভণিতা কোরো না, বলো, তারপর দূর হ'য়ে যাও।

প্রহরী। তাহলে এবার বলি। জানি না কে, এইমাত্র এসে
মৃতদেহ সমাধিবেদীতে রেখে সাজিয়ে গিয়েছে,
শেষ কাজ ক'রে গেছে একেবারে নিখুঁত নিয়মে,
বালি ফুল লতা পাতা ঠিকমতো ছড়ানো রয়েছে।

ক্রেয়োন। কার এই সাহস, তুমি কী বলছো, কী বলছো তুমি ?

প্রহরী। হুজুর, জানি না। কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি আসামি,

একটু কুড়ুল নেই, ঘাসের চাপড়া ঠিক আছে,
মাটি সেই শুকনো মাটি, একটিও লাঙলের রেখা
দেখতে পাইনি, এত সাবধানে করেছে সে-কাজ
আর কী কৌশলে সেই দেহ ঢাকা ধুলোর ছাউনিতে
যেন কোনো নোংরা হাত নোংরা চোখ না লাগতে পারে ;
হালকা ধুলোর ঢাকনা লেগে আছে, কেউ যেন এসে
বিছিয়ে দিয়েছে কোনো শাপমন্যি ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে,
না, না, কোনো জন্তু কোনো শিকারি কুকুর গন্ধ শুঁকে
কাছে এসে ছিঁড়ে যায়নি ম'রে-যাওয়া লোকটার শরীর ;
ওঃ, আমরা পাহারাওলার দল একে অন্যকে
দুষেছি এতক্ষণ, এমন কি এ ওকে দুই ঘা
দিতে গিয়েছিল, শেষে দেখা গেল সকলেই দোষী,
কিন্তু কেউ দোষী নয়। সবাই হলফ ক'রে বলছে
'আমি দোষী নই', 'আমি দোষী নই', 'আমি দোষী নই।'
সবাই তাতানো লোহা হাতে নিয়ে আগুন পেরিয়ে
যেতে রাজি, তিন সত্য করতে রাজি বিধাতার নামে ;
আসল আসামি যে কে তাও কেউ বুঝতে পারছি না,...
আমাদের মধ্য থেকে একজন এমন সময়
আমাদের মাথা নিচু ক'রে দিয়ে গ'র্জে উঠল,
আস্পর্ধা ছিল না কারো টুঁ শব্দ করি যে একবার,
সে আমায় বললো যেন আপনাকে সব কথা বলি,
কিছু না লুকোই যেন, আমি তাই অগত্যা এসেছি,
তাকে এড়াবার কোনো উপায় ছিল না ব'লে, তাই,
দুঃসংবাদের চর কে বা কবে তাকে ভালোবাসে ?

সূত্রধার। রাজন্, যখন ওর কথা শুনছিলাম, কাঁপছিলাম,
হয়তো এর মধ্যে কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত আছে।

ক্রেয়োন। আপনি সময় থাকতে থামবেন ? যদি ব'লে ফেলি
আপনি যতখানি বৃদ্ধ ঠিক সে-আন্দাজে বোকা লোক !
স্বর্গের আকাশে র'ন্ দেবতারা, তাঁরা কি কখনো
নরকের কীট দেখে গোর দিতে যান ব্যস্ত হ'য়ে ?
ঘরশত্রু যে তাঁদের রত্নদীপ নৈবেদ্যের থালা
স্তম্ভে খোদাই স্তোত্র ইন্দ্রনীল দেউলপাষাণ
ছারখার ক'রে দিতে এসেছিল তাকে মাটি দিতে ?
পাপীকে প্রশ্রয় দেন দেবতারা, আপনি বলবেন ?
না, না, সে তো হ'তেই পারে না। আমি তত মূর্খ নই।
এর মূলে কয়জন অতি বুদ্ধিমান নাগরিক...
আমার আদেশ শুনে ঘরে-ঘরে চোখ রাঙিয়েছে,
তারপর মাথা নেড়ে পরামর্শ আইন-ভাঙানি
কানাঘুষা ফিসফাস, চাপা শব্দ এখন চিৎকার।
ঘুষ দিয়ে সৈন্যদের মুখ তারা বন্ধ করেছে !
মানুষেরা মানুষের আত্মা কেনে মুদ্রাবিনিময়ে ?
সুন্দর মানুষ পেলে অর্থ তাকে পিশাচ বানায়,
ঘরবাড়ি ভেঙে-চুরে গৃহস্থকে ঘরছাড়া করে,
কেন যে মানুষ করে শয়তানের শিক্ষানবিশী,
আমি যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসী ক্রেয়োন হই, তবে
ভাড়া-করা শবচোর এই সেপাইরা একদিন
দণ্ড পাবে। আর শোনো শেষকৃত্য যে করেছে তার
খোঁজ দিতে না-পারলে শেষকৃত্য তোমারো পাওনা।
তাকে নিয়ে এসো, নইলে তিলে-তিলে শুকিয়ে মারবো,
ঝুলিয়ে রাখবো শূন্যে, পেরেক ফোটাবো সারা গায়ে,
আশা করি তবে শিখবে একজনের কর্মচারী হ'য়ে
সবার বেতন নেওয়া ভালো নয়। সঞ্চয়ের ফল

অপচয়, স্বর্গ নয় বিপথে যাবার কর্মফল।

প্রহরী। আমি কি এখন যাবো? অনুমতি করেন তো যাই।

ক্রেয়োন। তোমার প্রত্যেক শব্দ কাঁটা হ'য়ে বিঁধছে আমাকে।

প্রহরী। হুজুর, কোথায় বিঁধছে, মাথায়, না কানে, কোনখানে?

ক্রেয়োন। ব্যথার ঠিকানা নেবে বিদূষক নাকি বেয়াদব?

প্রহরী। ফেরারি আসামি তবে বুকব্যথা, আমি কর্ণশূল।

ক্রেয়োন। এ কোন লাগামছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল!

প্রহরী। ঐটেই শিখেছি, কিন্তু সেই কাজ কখনো করিনি।

ক্রেয়োন। করোনি? তোমার আত্মা অর্থমূল্যে বিকিয়ে দাওনি?

প্রহরী। দোষ বা'র করবেনই ভেবেছেন, আজব ব্যাপার।

ক্রেয়োন। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আখ্যা দাও এক হাজার বার,
কিন্তু চোরকে ধরতে, আর যদি দেরি করো তবে
দেখবে যে বাঁ হাতের কাজে কোনো সুফল হয় না।

[প্রাসাদের অভিমুখে তাঁর প্রস্থান]

প্রহরী। আমিও তো চাই তাকে পাওয়া যাক। অবশ্য একথা
ভাগ্যদেবী বোঝাবেন তাকে পাওয়া যাবে কি যাবে না।
আমার বরাত ভালো, মানে-মানে আজকের মতো
পালাই পৈতৃক প্রাণ বুকে নিয়ে, ঘরে গিয়ে বাঁচি,
আগে তো আপন বাঁচা, এর পর কী হবে কে জানে;

[প্রহরীর প্রস্থান]

সংস্তব

স্থায়ী : এক

বড়ো বিস্ময় এই যে মোদের নিখিলবিশ্ব ভ'রে
তার মাঝে হেরো আরো বিস্ময় মানবযাত্রী ওরে—
তটিনীসিন্ধু হেলায় সে হয় পার,
হিমানী পবনে সে রচে সৌধ তার,

গভীর গহন পথ ছেড়ে দেয়, গিরিচূড়া যায় স'রে
ঊর্ধ্বে অদিতি, নিম্নে জরতী ধরণী মৃত্তিকার
নিথর পাষাণে হলকর্ষণে ফসল আনে সে মোদের মাতৃক্রোড়ে।

অন্তরা : এক

দ্যৌস্পিতঃ পৃথিবি মাতরঞ্জগগ্নে মূলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং
বিয়ন্ত॥
জানি বিহঙ্গ স্রোতের পাথায় হাওয়ায় বিহার করে,
সাগরে বিহরে সাগরের মাছ, পশু বনকন্দরে—
মানুষ তবুও দিক্‌দিগন্তে পেতেছে বিশ্বজাল,
দুই হাতে ধরে বুনো হরিণের পাল,
পাগলা ঘোড়ার বলগা পরায়, বন্য বৃষেরে রজ্জুবিনীত করে॥

স্থায়ী : দুই

বাণী তার ধায় সীমান্তিকায়, কল্পনা অম্বরে,
হেরো মানুষের অটুট ধৈর্য নগরপ্রাকার গড়ে।
দুর্গ যে তার ঝঞ্ঝাতুষারজয়ী,
বুকে ভৈরবী 'ভোর ভয়ি' 'ভোর ভয়ি',
বীরবেশে ও যে সদা রয় প্রত্যয়ী,
রণবেশে ও যে অপেক্ষমাণ নব-নব সব কালবৈশাখী ঝড়ে,
কালভৈরবে তুলে ধরে তার আয়ুধ কালক্ষয়ী,
সমাধি ছাড়া সে আর সব-কিছু পার হ'য়ে যায়, অথচ মানুষ মরে।

অন্তরা : দুই

মানুষের কী মহিমা,
জাদু জানে ও যে পার হয়ে যায় দৃষ্টির দিক্‌সীমা,
এই ডেকে আনে অমানিশি আর এই আনে পূর্ণিমা;

নগরের নীতি স্বেচ্ছায় ভাঙে গড়ে,
দৈববাণীরে কলুষমলিন করে,
সৌধবাসীর পাশে ছাখো ঐ গৃহহারা পথ-'পরে,
চাই না তাদের যারা ম্লান করে শুভ্রের বর্ণিমা,
দুর্জন যেন ভুলেও কখনো পশে না মোদের ঘরে ॥

সূত্রধার

এ কী দেখি, আমি চোখে দেখি, নাকি মনে
চোখে লাগেনি তো কাজল বা কার্পাস ?
ব্যথার প্রতিমা ওই না আস্তিগোনে,
ব্যথায় পাথর পিতা যার ঈদিপাস
পিতার মতন করুণ বিজনবালা,
বন্দিনী ক'রে আনলো রণাঙ্গনে ?
রাজার আজ্ঞা ক'রে নেয়নি কি মালা ?
ঘূর্ণি বাতাস কাঁপে নৈঋৎ কোণে।

কোনো নারী-নিসর্গের প্রতি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

তুষার-তনু পাহাড় উঁচু। উত্তরের শেষ—
কল্পনার মালভূমির দেশ—
শুধালো মন—কে আছে আরো উঁচু তোমার চেয়ে
সে কোনো আরো উচ্চচূড়া আদর্শের ?
অন্যতর অথবা কোনো মাটির মৃদু মেয়ে ?
প্রশ্নটা কি শুনলো কেউ ? দাঁড়ালো এসে ধবল-চূড়া ছেয়ে
কোন মানসী মূর্তি এক মনের শত ইচ্ছাতে রঙিন—
'অভীপ্সার প্রতিকৃতি !—অতিকৃতি, অতিকৃতি—'
চেঁচিয়ে ওঠে অবাচী দেশ তরাই দক্ষিণ।
'সুদূর কোণে আমি তো প'ড়ে রয়েছি হ'য়ে নিচু ;
নাবাল সমতলের গায়ে রয়েছি হ'য়ে লীন ;
উত্তরের ঈর্ষা তবু আমার পিছু-পিছু
ডুবতে ছোটে অতল-তলে সাগর-মোহানায় !'
…ধবল চূড়া-শীর্ষে দেখি মূর্তি স'রে যায় !
তখনি বুঝি অভীপ্সার হয়েছে ভরাডুবি
দুঃখ হয় খুবই।

সমুজ্জ্বলা প্রকৃতি যেন নিমেষে মুখ কালো
করলো আর মরণ-মেঘে লুকালো মুখ আলো।
অবাক হই—এ কী এ অনাসৃষ্টি !
মেঘলা ভারি আকাশ আর পৃথিবী-জোড়া বৃষ্টি
সে-কথাটুকু বুঝিয়ে ছায় যে-কথা বোঝা শক্ত ;
সাপের মতো সোহাগ যার, পাপের মতো মিষ্টি
জেনেছি তবু হয়েছি তারই মাধুরী-অনুরক্ত।

অবাচী দেশ ডাকলো ফের দক্ষিণের দিন !
যেখানে ছোটে চরণ লঘু হাওয়ায় কে হরিণ,
সেখানে নেমে যাই—
ঘাসের দেশে খেলছে দেখি চপল এক ভালোবাসার মেয়ে
তাকেই উঁচু মানলো প্রাণ মালভূমির চেয়ে—
এখানে সেই তলিয়ে-যাওয়া অভীপ্সাকে পাই—
আসক্তিই শক্তি দিলো, আকাশ দিলো আলো,
চির-চাওয়ার সেতু বেয়েই যা-কিছু পাওয়া এলো—
সকল ছেড়ে নভস্পৃক্ আদর্শের কাচে
একটি মেয়ে সকল চূড়া ছাড়িয়ে দেখি আছে।
মুমূক্ষায় মূর্খ মরা শাস্ত্র-বাণী যতো
কখন দেখি হয়েছে পদানত।

দিশারী হ'লো তখন থেকে তুষার-তনু তার
বুকে পাহাড়, চোখে আকাশ নীল—
অভিলাষের পাখির চোখ হাওয়ার হাত-লাগা
চিনতে চায় দূর বনের পাতার ঝিলমিল !
অন্যমনে জাগছে সেই চিরকালের অভীপ্সার ভাষা
লীলায় তার দেখেছি খুঁজে রয়েছে অনিমীল।
নাম রেখেছি চূড়ালা রানী অনেক চূড়া দেহে
ঝলমলিয়ে স্মরণে আনে উত্তরাশা-দিন—
হৃদয় তবু অতল-তল নাবাল ভূমি বেয়ে
ঘাসের দেশে তাকেই পেলো হাওয়ার দক্ষিণ।

বলো তুমি

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বলো তুমি লিখে দেবে তোমার আপন হাতে নাম
আমার কবিতাভরা খাতাটার শেষের পাতায়
যদি আমি শেষ করি আমার এ-শূন্য পরিণাম
দীর্ঘ পথপরিক্রমা। যদি এই ধুলো কাদা পায়ে
তোমার অঙ্গনে এসে ক্লান্ত হাসি হেসে তবু ডাকি
শেষ ক'রে দিয়েছি আমার এই যাযাবর নাম,
প্রবাল-সাগর-তলে জীবনের সোনামোড়া ফাঁকি
ডুবিয়েছি। কোনো চরে সব স্বপ্ন পুড়িয়ে এলাম।

যে-আকাশে জীবনের সব তারা ঝলমল করে,
যে-বনের মর্মরেতে আশার পাতারা সব ঝরে ;
যে-নদীর তীরে-তীরে পদচিহ্ন একেলা শুথায়,
যে-দিগন্ত জড়ো হোলো তোমার ও-চোখের তারায়—
সে-আকাশ, নদী, বন, দিগন্ত হারিয়ে যদি যায়,
বলো তুমি ভ'রে দেবে তবু এ-জীবন কবিতায় ?

আমাকে নিঃশেষ ক'রে

বিকাশ দাশ

আমাকে নিঃশেষ ক'রে প্রতিটি মুহূর্তে বিলিয়েছি
তোমার সত্তার কাছে। তুমিও আকণ্ঠ ক'রে পান,
আবার পেতেছ হাত। আমি সেই মুঠি ভ'রে দিতে
ঢেলেছি উপুড় ক'রে যৌবনের মদির পেয়ালা।

আমার আকাশ-দূত তোমার দিগন্তে নেমে গেছে,
নীল চিঠি হাতে নিয়ে, শিহরিত বন-সহচরী,
আমার সত্তার পাখি নীড় খোঁজে তোমার ছায়াতে,
রাত্রির নির্জনে তুমি তবু যে তৃষ্ণায় জ্ব'লে মরো।

জ্বলে শূন্য মরুভূমি স্নায়ুতে শিরায় সারাক্ষণ,
'কী পেলে নিঃশেষে ঢেলে ?' শুধালো মনের যুবরাজ।
আর সেই মুহূর্তের তরঙ্গিত সৈকতে দাঁড়িয়ে
ভেবেছি ফিরিয়ে নিয়ে এইবার নিজেকে বাঁচাই।

আমার পেয়ালা শূন্য। তুমি তবু বন্ধ মুঠি খুলে,
জানালে,—'ভরেছে কই' ?—স্বপ্নের কিনার-ঘেঁষা মন
আমাকে তুষেছে খালি। তবুও স্বপ্নকে নিয়ে যদি
একান্তে কখনো বসি ছায়া ফেলে তোমার আকাশ।

দুটি কবিতা

দিব্যেন্দু পালিত

তিন রকমের ইচ্ছে

তিন রকমের ইচ্ছে আমাকে পাগল করে।

এক, যা রাজার মতো।
মদে আর আমোদে
চোখের স্বর্মায় রোজই খুঁজছে—
অন্তঃপুরে নতুন বসন্ত।

দ্বিতীয় ইচ্ছেটা স্বাবলম্বী হ'তে চায়।
রাজা নয়, রাজপুত্র।
পক্ষীরাজ নেই ; পক্ষীরাজের বাসনাও নেই—
অথচ পেশীতে সেই রকম রক্ত।
অনেক পথ পেরিয়ে—
হয়তো রাজকন্যার শিয়রে রুপোর কাঠি ;
গাঢ় ঘুম, আর রোদ, আর—
বন্য পেশীতে আকুল-করা ইচ্ছে।

তৃতীয় ইচ্ছেটা নিজেই ভারি অদ্ভুত।
রান্নাঘরের গুমোটে দাঁড়িয়ে
হাতের ময়লা তোয়ালেতে ঘাম মুছতে-মুছতে
আধ-বুড়ো বাবুর্চি ভাবে—
মেম সাহেবের ওই কচি, রাঙা আর শক্ত,
অথচ মিষ্টি নরম আপেল দুটো যদি পেতাম !

এই সব ভাবতে-ভাবতে
বাতাস যখন স্তব্ধ—
আর হাওয়া নেই, রোদও নেই ;
মরা দিনের নাড়ির মধ্যে
আত্মরতির মাছিটা ছটফট করে—

সব ভাবনাগুলোর গলা টিপে
হঠাৎ ভাবি—

আমি যদি নারী হতাম !

ফিরে যাওয়া

আমি তবে ফিরে যাই নদীর গভীর থেকে
গাঢ় ঘুমে ঢুলুঢুলু ঘাসে।
ফিরে যাই বাতাসের ক্লান্তিহীন
নীল বারো মাসে।

হয়তো মাথার চুলে তখনো রয়েছে কিছু রোদ।
কানে এসে বিঁধে গেছে মৃত এক শালিকের গান ;
পালাতে পারেনি। তার করুণ, কাতর, ভীরু প্রাণ—
হয়তো শিশিরে ভিজে মুছে দিয়ে গেছে সব বোধ।

সন্ধ্যাতারার ছায়া তার ম্লান চোখে কিছু আলো
ঢেলে দেবে। পিঁপড়েরা আলগোছে বেসে যাবে ভালো।
তারপর খুঁটে-খুঁটে,
ছোট্ট দেহের করপুটে—
সার বেঁধে চ'লে যাবে নরম মাটির খুব কাছে।

হয়তো তখনো বুকে আরো কিছু উত্তাপ
ঘন হয়ে আছে।

তখনো শ্রমের শেষে মানুষ খুঁজবে প্রিয় মুখ ;
আড়ালে লুকিয়ে লোভী যুবতীরা খুলে দেবে বুক।
কল্পনায় ডাক দেবে শিশুর নরম ঠোঁটে হাসির উদ্ভাস ;—
আরো দূরে যেতে-যেতে বাতাসে শুনবো বারোমাস।

দিব্য প্রতিমা

("To Mercy, Pity, Peace, and Love")

William Blake

দুঃখ যখন আঘাত করে সবাই ফেরে খুঁজে
মৈত্রী দয়া করুণা আর ভালোবাসা,
আনন্দময় নিত্যগুণকে জানায় বারে-বারে
ধরণী তার নিবেদনের নম্র ভাষা।

কারণ দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
পরম প্রভু, পরম পিতা, প্রিয়তম।
আবার দয়া ভালোবাসা মৈত্রী করুণাতেই
রচিত তাঁর সত্য মানুষ নিরুপম।

কে করুণা? হৃদয়ে তার হৃদয় মানুষেরই,
দয়ার মুখে এই মানুষের প্রতিকৃতি,
পুণ্য নরদেহই ছাখো, ভালোবাসার দেহ,
মরদেহের আঁচল জড়ায় মৈত্রী প্রীতি।

তাই তো বলি, দুঃখ যখন আঘাত করে বুকে
যে যেখানে ভক্তিভরে নোয়ায় মাথা,
তখন দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
মানুষকে বন্দনা করে, সেই বিধাতা।

হোক সে ম্লেচ্ছ, হোক ইহুদি, হোক তুরানি, তবু
বরণ কোরো মানবদেহের অধীশ্বরে,
যেথায় দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসা,
আছেন তিনি তাদের সঙ্গে সবার ঘরে॥

অনুবাদ : নরেশ গুহ

স্থাপত্য

স্থনীল চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত নির্মাণ করো; তা ভিন্ন তোমার মুক্তি নেই।
ওরাই রাক্ষস হ'য়ে ধ্বংস ক'রে যাবে তোমাকেই।

দুর্ভেদ্য মুঠোয় সব ধরো;
যেন না ছাড়াতে পারে; তারপর ধীরে, দ্রুত গড়ো।

ফেটে কারা যেতে চায় তারা হবে গম্বুজ সুন্দর,
চুরমার বোধ দিয়ে তোলো তুমি সূক্ষ্ম চিত্রলতা,
তোমাকে আমূল বিঁধে যারা আজ অঙ্কুশ বক্রতা
বঙ্কিম খিলান হবে, ধ্বংস যার নেই অতঃপর।

গভীর সময় এই। এই সেই শিল্পের আঘাত।
সুঠাম মিনার ক'রে গ'ড়ে তোলো অন্তর্ভেদী জ্বালা।
কঠিন আঁকড়ে ধরো ঝাঁপ-দেওয়া সব ডালপালা;
অপূর্ব অলিন্দে হ'বে জাফরি-কাটা চন্দ্রিকার রাত।

মারতে চেয়ো না পিষে। পারবে না। ধ্বংস হ'য়ে যাবে।
সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি ক'রে তোলো প্রাণশিল্পময়।
এই তো চরম যুদ্ধ। শিল্প লগ্ন। এ তো খেলা নয়;
সত্তার তোলপাড় দিয়ে স্থাপত্যের তপস্যা জাগাবে।

চীৎকার সংহত ক'রে লাবণ্যের ঢেউ-তোলা ছাদ
তোমার গড়ার আছে;—আক্রোশের, হিংস্রতার খাঁজ
কেটে-কেটে এঁকে যাও সুনিপুণ জালির সমতা;
কিছুই ফেলার নয়; এক খাতে বহাও অবাধ।

উপচে উঠেছে জল ? স্তম্ভ বেঁধে দাও সারি-সারি ।
কেন তুমি ভেসে যাবে ? লজ্জা ? গ্লানি ? বিশাল চত্বরে
ধীরে-ধীরে গেঁথে যাও । অপমান ? স্বচ্ছ সরোবরে
সোপানের শ্রেণী দাও । ঘৃণা ? ওরা ঝরোকা ও ঝারি ?

সব হাহাকার ছেনে প্রতিধ্বনি ভ'রে দাও ঘরে ;
তোমার সমস্ত শূন্য ঘিরে দাও খচিত দেয়ালে ;
ফাটে যা, ভাঙে যা, হানে, ছেঁড়ে, খোঁড়ে, জল হ'য়ে ঝরে—
সমাধিমন্দির ক'রে থেকে যেয়ো তার অন্তরালে ।

আগুনের মতো যদি তারো পরে কিছু থাকে জ্ব'লে,—
ভালোই । বাতির স্নিগ্ধ আলো হবে, রোজ, সন্ধ্যা হ'লে ।

তুমি আগে চলো

শান্তিকুমার ঘোষ

তুমি আগে চলো, বন্ধু, ঋজু ধাপ ভেঙে—
এই দুর্গের আড়ালে সমুদ্রের ছবি আছে :
উন্মাদ হাওয়া আর ঢেউ ;
হৃদয়কে মেলে দেবো মূর্ছার শিখরে ।

আয়নায় আলো ফেলে সংকেত জাহাজ দেয় সমুদ্রে কেবল ।
সে-আলোয় ভাখো দূর অতিবলয়িক নানা পথে
নরনারী বস্তুভার চলে ঘোর নিবিড় জগতে ।
বস্তুর বিস্তৃত বিশ্ব—সত্তায় সম্পূর্ণ, ভিন্ন—
শক্তির তাড়িত পুঞ্জ দাউদাউ অনন্ত অবধি ।

অনন্তের দিকে গতি
আলোর তীরের মুখ, পাখির নিয়তি বেগ
অনন্তের দিকে ।
ডুবে যায় একে-একে উপত্যকা খেত নদী
উপরের থেকে দেখা ।
শূন্যের স্মারকচিহ্ন—করুণ মাথার খুলি
পথের তোরণে ।
বিপরীত জলস্রোত আছড়ায় বুকে এসে
—ভীষণ নির্জন তবু !
ভালোবাসা এত যাকে সে যেন আঁধার-লীনা
কখনো গেল না দেখা ধূপছায়া রূপ যার ।
অর্গলবিহীন ঘর, চেয়ারের বিশালতা কৈশোরের ভয়ে ভরা ।
ধূম্রকূটে ডুবে কোন গাঢ় ঘুমে জেগে থাকা আচ্ছন্ন প্রহরে ।

পলাতক কারা সব তন্দ্রায় ভুলেছে নাম নিরুত্তর প্রহরীর ডাকে ;
স্বপ্নের নির্মাণ নীড় অনেক উঁচুতে দোলে ঝড়ের বাতাসে।
ক্যান্থতে আরোহী কত মস্তক বিজয়ে চলে শতকে দশকে।
আশা নেই···দু মুহূর্ত···কী মধুর কমনীয় ব্যর্থ ভালোবাসা।
শব্দের জগৎ ভেঙে পরমাণবিক বেগ কবিতার ব্যথা।

আভার সমুদ্র এক :
সূর্যের নিকটে দূরে
নীল ঝরে নীল শুধু বর্ণহীন রূপ :
দর্পণ আলোকে পোড়ে আমার বিস্মিত মুখ,
কল্পনার উর্ণনাভ, প্রেম।

তাই আগে এসো, বন্ধু, দৃশ্যের অতীতে
সন্ধ্যার সমুদ্র বেয়ে
নিস্তব্ধ যেমন
বর্ণিল জগৎ ছেড়ে প্রায়ান্ধ বালক চলে ধ্বনিময় লোকে ॥

জলের পুরাণ (অংশ)

জ্যোতির্ময় দত্ত

শবদর্শন

এতোদিনে যুবতীর উন্মাদনা স্থির।
মৃত নয়, জলের নিষিদ্ধ গভীর
অন্ধকার জীবনে নীরবে জীবিত
নিভৃত জীবনের কৃষ্ণপুলকে স্ফীত,
নীরবে ভাসমান এক অতিকায় জলজ উদ্ভিদ।

আজ শ্যাওলার জীবন্ত, সবুজ শাড়ির
ভাঁজে-ভাঁজে হাল্কা নতুন তার জলের শরীর ;
এতোকাল দেহ ছিলো শুধু রক্তের কবর—
অন্তরে বাহিরে আজ উষ্ণ কিংবা স্নিগ্ধ শীতল
জল, জীবনের আদিম সম্বল।

মৃত্যুর আগে, মেয়েটি প্রথমবার যখন নিষাদকে দেখলো

হারানো জলার পুলকিত সরের মতো,
দুহাতে একটু সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো
এক ঘোর পুরুষ ; এমনকি প্রথম বর্ষার শৈবালও
তার উজ্জ্বল ত্বকের চাইতে জীবন্ত নয়,
তার কৃষ্ণ শুদ্ধতার তুলনায়

অপর মানুষেরা যেন নকল উদ্ভিদ, অত্যুজ্জ্বল
ঋতুদের সাজানো পুতুল। যেমন যখন
জাগেন কোনো প্রশান্ত উদার হিমবাহ,

থেমে যায় ঋতুদের চীৎকার আর অস্থির হাওয়ার কোলাহল,
তখনো তুষারের সারা গায়ে কুয়াশার দুর্বল স্নেহ

লেগে থাকে কোনো প্রাচীন বিধবার অশরীরী উষ্ণতার মতো,
তেমন তার পোকার প্রাণের মতো মৃদু,
বাড়ন্ত জলের চাইতে আতত
মুগ্ধ আকৃতির কেবল সম্বল
হারানো নিষাদের এই মায়ার আদল।

চারিদিকে গম্ভীর, প্রাচীন বৃক্ষেরা
সম্মত ছিলেন ; সেই গভীর জীবগণ
দেখলেন তাঁদের তনয়ার পুণ্য সম্মোহন,
এবং সেই উপবাসমৌন সন্ন্যাসীদের
নাভীর কোটর যেন সুগন্ধ দুধের
তরলতায় ভ'রে গেল।···

রাখাল কী ভাবে তার এই সম্মোহন ভাঙলো

কিন্তু রাখালের হাত, যেন তার পালিত কাঠবেড়ালি,
শরীরের ঘন আঘ্রাণে হ'য়ে গেছে বুনো ;
তার দেহের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে

বুকের কাছে খুঁজে পেলো শ্যামল, শীতল দুই অতি-ঘনিষ্ঠ স্তূপ ;
বুঝে গেলো এই তার হারানো দুই ভ্রাতার কবর ;
স্তব্ধ এখন তাই প্রগল্‌ভ জন্তুর ধড়।
মেয়েটি চমকে দেখলো, বুকের বিজনে অপঘাত
কোনো সফল জন্তুর নয়, নিতান্তই আড়ষ্ট এক মানুষের হাত
স্তনের কোটর ভ'রে আছে।···

নিষাদ আবার দেখা দিলেন

তবুও নিস্তার নেই। নিষাদের ছদ্মবেশ
চাঁদের আগমনের প্রথম আভাসে
খ'সে যেতে লাগলো। মেঘ তাঁর প্রাচীন কেশ,
রাত্রির রহস্য তাঁর চারিপাশে,
তাঁর অসীমতায় নির্ভয় জলশিশুর মতো

সমস্ত পৃথিবী খেলা করে। চুলে চাঁদ
ঢেলে দিল স্বর্গের দুধ,
আলোর ধারা যেন অর্বুদ,
নীরব, রহস্যময় বকের ঝাঁক
চুলের জটার ওপারে সেই নিভৃত আলোর হ্রদ

ছেড়ে উড়ে আসছে পৃথিবীর কোনো নিঃশব্দ জলার
স্তম্ভিত বুকে।···

দেবতার কৃপায় সে ডুবে গেলো

দেহের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে—
এমন এক পরম দেহসারে
যেখানে জল আর জলের রূপক,
মাছের চোখের নির্মল দুঃখশোক,
এক হ'য়ে গিয়ে শুধু অন্ধকার হয়েছে।

সাইবেরীয় পাখিরা যেখানে পোহাতো রোদ্দুর,
তার জঙ্গম হৃদয়ের উৎস সেই সুদূর,
প্রশান্ত হ্রদে। তারপর, বেগান্ধ নদীর মতো,

হে কন্যা, ঘুরেছো জঙ্গলের জটিল পাকস্থলী ;
পাতালের উষ্ণ গর্তগুলি

ভরেছো জলদানে। শ্যাওলা আর বেতের কবর
যখন আসন্ন মনে হ'লো, তখন, হে পুণ্য নদী,
ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখলে সেই আদি,
বিশুদ্ধ জল, এতো স্থির, যে মনে হ'লো
উপরের শান্ত, শ্বেত সর

বুঝি ফেটে যাবে তোমার প্রবেশের আলোড়নে।
কিন্তু, আসলে, তোমার স্মরণে
একটি বুদ্বুদও জাগলো না। নিজের বিশুদ্ধতায়
জলের আপন হয়ে গেলে। হে পরম মাতা, তোমার প্রমায়
আমাদের এই একান্ত নিরপরাধ-কন্যাকে রেখো।

প্রত্যবায়

অমিয় চক্রবর্তী

"দিনে জোড়া লাগবে না, আলোর উগ্র বিচিত্রতা
বহু-চক্ষু সমাজের ভুল দৃষ্টি মিশে
চেরা জীবনের ক্ষতে বাড়াবে আরোই দগ্ধ ব্যথা,—"
বলেছেন সন্ত ; আর মন্ত্র দিয়েছেন সান্ধ্য হোমে
পরম রাত্রির ইচ্ছা জেলে-তোলা আত্মার নিমিষে ;
জপমন্ত্র ; পুরাণী নক্ষত্র-নিশীথিনী
জাগে যেথা জয় ক'রে কৃষ্ণা বিস্মরণী যুগে-যুগে,
ঊর্ধ্বময় ধ্যানশিখা তারি আবর্তনে
স্নিগ্ধ হয়ে মর্ত্যে নামে পূর্ণতায়।

মন্ত্রদাতা, রাত্রি এলো, কী ক'রে বলো সে-পথ চিনি—
কোথায় আশ্বাস এই গোধূলির অশান্ত প্রত্যয়ে
যেখানে সঙ্গম-জল-মাটি
হারায় অগণ্য ঢেউয়ে ; পৃথিবী কান্তার, দিক্-ঘেরা।
লুপ্ত ক'রে জীব সন্ধি আমার চৈতন্যে নিবিড়,
ঢেকে দিয়ে দৃশ্য সেই যার অন্তর্গত ব্যথা-জাগা
বাঁচার জেনেছি সুধা, ভরে সমাধির
এ কী অবর্ণতা, যোগ-সংকট মুহূর্ত ঘন হয়ে
চূর্ণ হোক শেষ রাত্রি, না হলে প্রত্যহ বক্ষে-ঘেরা
জলুক নির্মম সূর্য, যৌবনী জনতা দৃপ্ত দিবা—
আবার সংসারে যুঝি, খুঁজি সেই প্রাণ অক্ষৌহিণী॥

চিঠিপত্র

ইংরেজি ও মাতৃভাষা

(বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত) ১০ জুন, ১৯৫৮

প্রিয়বরেষু,

পৌষ-ফাল্গুনের কবিতা পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধটি খুব ভালো লাগলো। "ইংরেজি ও মাতৃভাষা" নামে ঐ রচনা আশা করি বহুল প্রচারিত হবে; ইংরেজিতেও ভারতের নানা জায়গায় বেরোনো দরকার। বিষয়টা প্রকাণ্ড জটিল, ভবিষ্যৎ দূরে থাক্ ঠিক এখনই কী ব্যবস্থা দাঁড়াবে বলা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ভাষার মূল্য যেখানে গভীর সেই কেন্দ্রিক স্থানে ক্রমান্বয় আলোচনা জাগিয়ে রাখা চাই। আপনি বাংলা ভাষার এবং বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার কথা তার সৃষ্টিশীল প্রবাহের দিক থেকে সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন; এই আলোচনায় যোগ দেবার অধিকার তাঁদেরই যাঁরা ভাষাকে চিন্ময় জ্ঞানময় সত্তার অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জানেন।···

রাষ্ট্রিক দিক যে নেই তা নয়, খুবই আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষা হবে সংস্কৃতির বৃহত্তর ভূমিকায়,—আশা করি প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে কথা বুঝবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যবুদ্ধি এবং জাতীয়তা কারো চেয়ে কম নয়, আমাদের বিশেষ দায়িত্ব যেন প্রাঞ্জল অনুশীলন এবং প্রচারের দ্বারা আমরা অনেকখানি আলোহাওয়া এই প্রসঙ্গে চারিয়ে দিতে পারি। "কবিতা"র পৃষ্ঠায় আপনি তাই করেছেন।···

আমি দূরে আছি, সব জিনিষটাকে ঘাঁটিয়ে দেখতে পারছি না। ভারতের প্রত্যেক জাতীয় ভাষাকে চরম এবং স্বতন্ত্র মূল্য না দিয়ে পারি না; ইংরেজিকেও সেই ভারতীয় ভাষামণ্ডলীর অন্তর্গত ব'লেই জানি। দেশজোড়া মানসিক এবং বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে ইংরেজি আধুনিক যুগের ভারতবর্ষে ক্ষীয়মাণ হ'তে থাকবে তা ভাবাই যায় না, কেননা আজকের পৃথিবীতে সর্বরাষ্ট্রিক একটি

বা একের বেশি বহুসচল ভাষার দাবী বেড়ে যাচ্ছে, কমছে না। খাঁটি সাহিত্যের দিক থেকে আমার মনে কিছু খটকা আছে,—ভারতবর্ষ যে ইংরেজি ভাষায় উৎকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় দেবে, সহজ প্রত্যহ অধিকারে আপন গরিমা প্রকাশ করবে তার আশা কম। কেনই বা তা আশা করবো, বস্তুত, আজকের ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার উৎকর্ষের দিক থেকে নীচুতে নেমেছে, এবং হয়তো আরো নামবে, যদিও সংখ্যায় হয়তো বেশি লোক ইংরেজি ব্যবহার করে এবং করবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাও থাকবে ভারতের অন্যান্য জাতীয় ভাষার পাশাপাশি; বিশেষ গরিমার স্থান তার না-ই বা হ'লো,—ইংরেজি ব্যবহারের স্রোত ভারতে মুক্ত রাখাটাই প্রধান কথা। সাহিত্যসৃষ্টি মুখ্যভাবে চলতে থাকবে প্রত্যেক ভারতীয় অঞ্চলের নিজস্ব ভাষায়। আপোষে এইটে মেনে নিতে দোষ কী?···

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাসাচুসেটস **অমিয় চক্রবর্তী**

হুইটম্যান ও নজরুল ইসলাম

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১ "কবিতা"য় শ্রী নরেশ গুহ মহাশয়ের "ওঅল্ট হুইটম্যান—একশো বছর পরে" প্রবন্ধ পাঠ করলাম। অতি সুন্দরভাবে হুইটম্যানের কবিতার ধারা ও কাব্যমানসের উন্মোচন করা হয়েছে। প'ড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হলাম।

প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি লিখেছেন: "আসলে হুইটম্যানকে আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রবেশ করলেন 'কল্লোল' যুগের কবিরা, বিশেষ প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু ইউরোপীয় ট্র্যাডিশন-ভাঙার যে-বলিষ্ঠ প্রেরণা থেকে Song of Myself-এর মতো কবিতার উত্থান—বাংলা দেশের পরিবেশে কোথায় সেই প্রেরণা?···হুইটম্যান যেখানে সমগ্র জীবনের বন্দনাগানে মুখর, সেখানে বাংলা দেশের কবি মৃদুকণ্ঠে লিখছেন:

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাশ-বিবশ মর্মের মত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই।

…বাংলা কবিতায় হুইটম্যানের সুর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সচেতন পরিশ্রম সত্ত্বেও তাই মেকি প্রতিধ্বনি হ'য়েই শেষ হ'য়ে গেল।"

নরেশবাবুর এই অভিমত তথ্যনির্ভর নয়। বাঙালী কবির কাছে হুইটম্যানের আবেদন আদৌ পৌছয়নি, পৌছলেও তা খুব মিহি ও "মেকি", এ কথা ঠিক নয়।

কবি নজরুল ইসলাম বিপুলভাবে এবং সার্থকভাবে হুইটম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় হুইটম্যানের সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্কের কথা বিপুলসংখ্যক বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকের আজো অজ্ঞাত। হয়তো এর প্রধান কারণ বিশ্লেষণী ও মননশীল পাঠকের অভাব এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকার জাতীয় কবির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের দূরত্ব। তবু এই দূরত্বকে আমাদেরই এক প্রিয় কবি স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিলেন।

ইংরেজি সাহিত্যের ফরাসী ইতিহাসকার লুই ক্যাজামিয়ান ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Lyrical Balladsএর আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে এঁদের সৃষ্টি-কর্মে যে-নীতি সক্রিয়, তাকে "an aesthetic application of sentimental democracy" বলা যায়। নজরুল ইসলামের সাহিত্যের প্রধান সুরটিকে মনীষী ক্যাজামিয়ানের কথাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় an aesthetic realisation of sentimental democracy। নজরুল ইসলাম যেমন, হুইটম্যানও তেমনি, জীবন, যৌবন, গান, প্রাণ ও 'গণতন্ত্রে'র কবি। নরেশবাবু জানিয়েছেন হুইটম্যানের আবেদন বাঙালী কবির কাছে পৌছলেও তা অসার্থক হয়েছে। এই উক্তি সত্য নয়। হুইটম্যানের ভাবাদর্শে রচিত নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান সার্থক তো হয়েছেই, এমন কি আবেগ ও আবেদনে তা মাঝে-মাঝে হুইটম্যানকেও অতিক্রম করেছে। নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতার প্রেরণা হুইটম্যানের Song of Myself থেকেই এসেছে। "বিদ্রোহী"র "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"—এই সুর

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মজয়ঘোষণারই সুর। Song of Myself-এর প্রধান সুরও তাই—হয় তো বা আরো ব্যাপক। নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জির' কাব্যের "অগ্রপথিক" কবিতাটি ("অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম চল রে চল") আমাদের অতি পরিচিত ও প্রিয়। কিন্তু এই বিখ্যাত কবিতাটিও হুইটম্যানের Pioneers! O Pioneers! কবিতার হুবহু অনুবাদ এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক সার্থকতম অনুবাদ। কবিতাটি প্রথম যখন "সওগাতে" প্রকাশিত হয়, তখন নজরুল ইসলাম নিজেই পাদটীকায় হুইটম্যানের ঋণ স্বীকার ক'রে লিখেছিলেন, "ওঅল্ট হুইটম্যানের 'Pioneers'-এর ভাবানুসরণে"। কিন্তু পরবর্তী সংকলনসমূহে এই স্বীকৃতি দেখা যায় না। জানি না, এ অপরাধ নজরুল ইসলামের, না প্রকাশকদের।

বড়শিজা, বীরভূম

রাশীদুল হাসান

আধুনিক কবি অমিত রায়

'আধুনিক কবি অমিত রায়' ('কবিতা', পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬৪) প'ড়ে দু-একটি কথা মনে হ'লো; সংক্ষেপে জানাই।

'কল্লোল'-যুগের বিদ্রোহ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সার্থক, সে-বিষয়ে বিতর্ক আজ অবান্তর। কবি বা মানুষ রবীন্দ্রনাথ আজ তাঁর মৃত্যুর ১৭ বছর পরে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছেন, সময় তা দেখছে। বাংলা কবিতা তাঁর সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেনি সচেতন পাঠকমাত্রেই সে-খবর রাখেন। 'রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত' হওয়া এখনকার কবিদের সমস্যা নয়; আধুনিক কবিতা আজ স্বকীয় অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত। মনন যে আরো তীক্ষ্ণ হবে, জটিল হবে, দৃষ্টি যে আরো ব্যাপক হবে, প্রত্যয়ের ভিৎটাও যে টলবে, এটাই তো এ-যুগের দাবী, এবং তাই সজ্ঞান পাঠকের কাছে অমিত রায়ের নিঃসারতা ধরা পড়েই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এ-বিষয়ে অনবহিত দিলেন তা মনে হয় না; তার প্রমাণ অমিত রায়ের উক্তি,—'একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না

থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।' এখন, অমিত রায়কে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন 'আধুনিক' কবিদের প্রতিমূর্তিস্বরূপ দাঁর করাতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা, তা যদি বিবেচ্য হয় তবে অমিত রায়ের মনোভাবসম্পন্ন পুরুষ সে-যুগে ছিলেন না বা এ-যুগে নেই তাও বা কী ক'রে বলা যায়—নরেশবাবু নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

আমার মনে হয় সব মিলিয়ে অমিত রায় এক সার্থক ব্যঙ্গচিত্র। 'শেষের কবিতা'র মূল্য এ-দিক থেকেও উল্লেখ্য। নরেশবাবু বলেছেন, '—আমরা যে "শেষের কবিতা" নিয়ে অসুখী তার সঙ্গে রুচিবদলের কোনো সম্পর্ক আছে এমন অনুমান আমি একেবারেই বরখাস্ত ক'রে দিতে চাই।' কিন্তু তা কেন? 'রুচি' কথাটা কি এতই ভঙ্গুর? রুচিগঠনে কী কী প্রভাব কাজ করে, তা যদি বিচার করতে বসি তবে দেখি যে প্রথমেই আসে মানসিক প্রবণতা। সেই প্রবণতায় পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথও আক্রমণ ক'রে থাকলেও অস্বীকার করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত ইচ্ছে করলেও 'আধুনিক' কবিতা লিখতে পারতেন না। কিন্তু সে-প্রশ্ন কি আমাদের পক্ষে খুব জরুরি আজ? বরং আধুনিক কবিতা কোথায়, কেন, কী ক'রে 'আধুনিক' হ'লো সে-বিষয়েই শ্রী নরেশ গুহর কাছে আমরা আলোচনার প্রত্যাশী।

কলকাতা

শৈলেশ রায়

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই সংখ্যার সঙ্গে আপনার চলতি বছরের চাঁদা শেষ হ'লো। পরবর্তী বর্ষ ২৩-এর চাঁদা (চার টাকা) আগামী **২০শে অক্টোবরের মধ্যে** মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানাই। যাঁরা আর গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন তাঁদের **নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো দরকার।** যাঁদের কাছ থেকে চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা কোনোটাই পাওয়া যাবে না, তাঁদের আমরা আশ্বিন সংখ্যা ভি. পি. যোগে পাঠাতে বাধ্য হবো। ভি. পি.তে পাঠাতে আমরা অনিচ্ছুক, কেননা তাতে অতিরিক্ত এক টাকা খরচ পড়ে, এবং সেই ব্যয় গ্রাহকদেরই বহন করতে হয়। উপরন্তু, ভি. পি. ফেরৎ এলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হই। ভি পি.তে যাঁরা পত্রিকা পাবেন, তাঁরা প্যাকেটটি গ্রহণ করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হ'লে বিশেষ বাধিত হবো।

মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাবার সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়:

(১) কূপনে গ্রাহক নং উল্লেখ করবেন।
(২) নূতন গ্রাহকরা "নূতন গ্রাহক" কথাটি লিখে দেবেন।
(৩) কূপনের উল্টো পিঠে পরিষ্কার অক্ষরে নাম ও ঠিকানা লিখবেন।
(৪) যাঁরা **রেজিষ্টার্ড ডাকে** পত্রিকা নিচ্ছেন বা নিতে চান তাঁরা **ছয় টাকা** পাঠাবেন।

পাকিস্তানের গ্রাহকদের কোনো ভারতীয় ডাকঘর থেকে মনি-অর্ডার পাঠাবার অনুরোধ জানাই; তা সম্ভব না-হ'লে ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্যবস্থা করতে হবে। পত্র লিখলে আমরা ব্যাঙ্কে দাখিলের জন্য বিল্ পাঠিয়ে দেবো।

চিঠিপত্র, মনি-অর্ডার, চেক ইত্যাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

লেখকদের বিষয়ে

* 'কবিতা'য় প্রথম প্রকাশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র 'আন্তিগোনে' অনুবাদ নয়া দিল্লির সাহিত্য আকাদেমি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। *__দিব্যেন্দু পালিত__ পড়াশুনো করেছেন ভাগলপুরে, বর্তমানে কলকাতায় কর্ম করেন। তাঁর গদ্য ও কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। **বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'নিরন্ত নির্ঝর' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। **বিষ্ণু দে**-র দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলো: 'আলেখ্য' ও 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'। গত গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত কবিতা-মেলা তাঁকে ও শ্রী অজিত দত্তকে সম্মাননা জানিয়েছেন। *__ব্রজমাধব ভট্টাচার্য__ ব্রিটিশ গিয়ানাতে টেগোর মেমরিএল স্কুলের অধ্যক্ষ। **শান্তিকুমার ঘোষ** লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। **সঞ্জয় ভট্টাচার্য**-এর উপন্যাস 'অপরা' প্রকাশ করেছেন নিউ স্ক্রিপ্ট। আর-একটি উপন্যাস, 'তিন চরিত্র' সবিতা প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিভা বসু-পরিচালিত

শিশুবিতান

একটি নতুন ধরনের স্কুল।
নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত
ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়।

ভর্তি চলছে।

১১২/১ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলকাতা ২৬

অনুসন্ধানের জন্য—
টেলিফোন: ৪৬-১২০৪

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
নতুন কবিতার বই

নিরন্ত নির্ঝর

প্রকাশক: শতভিষা প্রকাশনী

দুই টাকা

কবিতাভবনে প্রাপ্তব্য

KAVITA

(*Poetry*)

Vol. 22, No. 4

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ
কারণ
গুণে অতুলনীয়

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪